তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশকল্প।

তৃতীয় ভাগ।

১৮৩১ শক।

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৬। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিগতাব্দ ৫০১০। ১ চৈত্র, মঙ্গলবার।

মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সপ্তদশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

অকারাদি বর্ণক্রমে সপ্তদশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র।

সপ্তদশ-কল্প
তৃতীয় ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৮৯ সংখ্যা ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, মঙ্গল।

(তৃতীয় উপদেশের অনুবৃত্তি)

আর একটি নীতিবাদের কথা বলিব যাহার বাহিরটা দেখিতে বেশ উন্নত কিন্তু যাহার ভিতরে একটা দূষিত নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

কেহ কেহ এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরেই চারিত্র-নীতির ভিত্তি স্থাপিত। সেই ইচ্ছার অনুসরণ ও লঙ্ঘনের সহিতই ঈশ্বর দণ্ড পুরস্কার জুড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই দণ্ড পুরস্কারের দ্বারা চালিত হইয়াই মনুষ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

এই বিষয়টি একটু সংকোচের সহিত আলোচনা করিতে হইবে।

এ কথা সত্য,—বিবিধ যুক্তির দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে ঈশ্বরই নীতির চরম ও পরম মূলতত্ত্ব;—এমন কি ইহা বেশ বলা যাইতে পারে যে, ঐশ্বরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশই মঙ্গল; কেন না, ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই সনাতন ন্যায়ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি যাহা তাঁহার মধ্যে নিত্য অবস্থিত। অবশ্য ঈশ্বরের এই ইচ্ছা—তিনি যে ন্যায়ের নিয়ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে আমরা কাজ করি; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না,—তাঁহার খামখেয়ালি ইচ্ছা অনুসারে তিনি এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। সে কথা দূরে থাকুক,—ন্যায়ের নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে এই জন্যই রহিয়াছে, যেহেতু সেই নিয়মের মূল তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে, তাঁহার অন্তরতম স্বরূপের মধ্যেই চিরবিদ্যমান।

ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর যে নীতিবাদ স্থাপিত, সেই নীতিবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহা বাদ দিয়া তাহার মধ্যে যাহা মিথ্যা, যাহা অসঙ্গত, যাহা নীতিবিরুদ্ধ তাহাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমত, যে কোন ইচ্ছাই হউক না কেন,—ইচ্ছার দ্বারা যেমন সত্য সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সেইরূপ ইচ্ছার দ্বারা মঙ্গলকেও প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ঐশ্বরিক ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা আমাদের নিজের ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন।

ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, এই দুই ইচ্ছার মধ্যে অসীম ও সসীমের প্রভেদ ভিন্ন আর কোন প্রভেদ নাই। এখন দেখ, আমরা ইচ্ছার দ্বারা আমি লেশমাত্রও সত্যকে স্থাপন করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা সসীম বলিয়াই কি পারি না? না, তাহা নহে; অসীমশক্তিসমন্বিত হইলেও ইচ্ছা এই বিষয়ে সমান অশক্ত। আমার ইচ্ছার প্রকৃতিই এই,—কোন কাজ করিবার সময় এই জ্ঞানটি থাকে,—আমি ইচ্ছা করিলে ইহার উল্টাটাও করিতে পারি; আর ইহা ইচ্ছার একটা আগন্তুক লক্ষণ নহে, ইহাই ইচ্ছার মুখ্য লক্ষণ; অতএব, এরূপ যদি মনে করা যায়, সত্য কিংবা সত্যের যে অংশকে ন্যায় বলে, তাহা—কি ঐশ্বরিক, কি মানবিক—কোন ইচ্ছার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয়, অন্য কার্য্যের দ্বারা অন্য আর কিছু স্থাপিত হইতেও পারিত; অন্যায়কে ন্যায় করা যাইতে পারিত, ন্যায়কে অন্যায় করা যাইতে পারিত; কিন্তু এরূপ অধ্রুবতা ন্যায় ও সত্যের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বাস্তবপক্ষে, দার্শনিক তত্ত্বসমূহের ন্যায় নৈতিক তত্ত্বগুলিও স্বতঃসিদ্ধ ধ্রুবসত্য। কারণ ব্যতীত কার্য্যের সম্ভাব, বস্তু বিনা গুণের সম্ভাব ঈশ্বরও ঘটাইতে পারেন না; সত্য পালন করা, সত্যকে ভালবাসা, প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করা মন্দ—ইহাও ঈশ্বর স্থাপন করিতে পারেন না। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ সূত্রগুলির ন্যায় নৈতিক সূত্রগুলিও অপরিবর্ত্তনীয়। মন্‌টেস্‌কিউ সমস্ত নিয়ম সম্বন্ধে সাধারণতঃ যাহা বলিয়াছেন, নৈতিক নিয়মের সম্বন্ধে সে কথা বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা সেই সব অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ যাহা বস্তুসমূহের নিজস্ব প্রকৃতি কিংবা স্বরূপ হইতে উৎপন্ন।

ধরিয়া লও,—মঙ্গল ও ন্যায় ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাব আছে তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু কোন ইচ্ছার দ্বারাই অবশ্যকর্ত্তব্যতা স্থাপিত হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা—একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের ইচ্ছা;—আর আমি একটি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীব। একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের সহিত একটি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীবের এই যে সম্বন্ধ—ইহার মধ্যে কোন নৈতিক ভাব থাকিতে পারে না। বলের দ্বারা বাধ্য হইয়া কোন বলবান্ ব্যক্তির আজ্ঞা আমরা পালন করি, কিন্তু অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে তাহা পালন করি না। ঈশ্বরের অন্যান্য উপাধি হইতে যদি মুহূর্ত্তের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিব, ঐশ্বরিক ইচ্ছা-প্রেরিত দুর্লঙ্ঘ্য আদেশের মধ্যে ন্যায়ের কণামাত্রও কিরণ নাই; সুতরাং তাহা হইতে অবশ্য কর্ত্তব্যতার কণা মাত্র ছায়াও আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে না।

কেহ কেহ এই কথা বলিয়া উঠিবেন:—এই যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা ও ন্যায়—ইহা ঈশ্বরের খাম্‌খেয়ালী ইচ্ছা হইতে নহে পরন্তু ঈশ্বরের ন্যায়-ইচ্ছা হইতেই স্থাপিত হইয়াছে। বেশ কথা। তাহা হইলে ত সবই উল্‌টাইয়া যায়। তবেই দাঁড়াইতেছে—নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে এই অবশ্যকর্ত্তব্যতার উৎপত্তি নহে, পরন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা নিয়মিত হয় অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে যে ন্যায়ধর্ম্ম অবস্থিত, সেই জ্ঞানই, সেই ন্যায়ধর্ম্মই এই অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাব আমাদের মনে আনিয়া দেয়। অতএব, ন্যায়-অন্যায়ের যে প্রভেদ, তাহা তাঁহার ইচ্ছার কার্য্য নহে।

এই দুইয়ের মধ্যে একটা হওয়া চাই ঃ—যদি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরেই ধর্ম্ম-নীতিকে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ভাল মন্দের প্রভেদ, ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদের কোন মূল্য থাকে না, এবং তাহা হইলে ধর্ম্মনীতির মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাবও কিছুই থাকে না। আবার যদি ন্যায়কেই ঈশ্বরেচ্ছার প্রমাণ বলিয়া ধর, যে ন্যায়, তোমার সিদ্ধান্ত অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই প্রামাণিকতা লাভ করে,—তাহা হইলে তুমি চক্র-ন্যায়ের ভ্রমে পতিত হইবে।

আর একটা চক্র-ন্যায়ের ভ্রম আরও স্পষ্টরূপে এই স্থলে লক্ষিত হয়। প্রথমে, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে ন্যায়ধর্ম্ম উৎপন্ন—এই সিদ্ধান্ত বৈধরূপে স্থাপন করিতে হইলে, বাধ্য হইয়া তোমাকে মানিয়া লইতে হয় যে, এই ইচ্ছা ন্যায়মূলক; কিন্তু আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, শুধু এই ইচ্ছা হইতে ন্যায়ধর্ম্ম কখনই স্থাপিত হইতে পারে না। তা ছাড়া, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যদি পূর্ব্ব-হইতেই তোমার মনে ন্যায় সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা না থাকে, ঈশ্বরের কোন্ ইচ্ছা ন্যায়মূলক তাহা তুমি বুঝিতেই পারিবে না।

এক পক্ষে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহা না জানিয়াও ন্যায় সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা থাকিতে পারে ও আছে; পক্ষান্তরে, ন্যায় সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা না থাকিলে, ঐশ্বরিক ইচ্ছার ন্যায্যতা তুমি বুঝিতে পারিবে না।

এখন দেখ, আমরা যে নীতিবাদ সম্বন্ধ বিচার করিতেছি তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি এই ;—শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই অমুক কাজ ন্যায্য ও অমুক কাজ অন্যায্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শুধু একটা খাম-খেয়ালি আদেশের দ্বারাই যে এই ইচ্ছা অভিব্যক্ত হইতেছে তাহা নহে,—আবার এই ইচ্ছা, ঐ আদেশের সঙ্গে আশা ও ভয়ের ভাব জুড়িয়া দিয়াছে।

পারলৌকিক দণ্ডের ভয় ও পুরস্কারের আশা কোন্ মানব-বৃত্তির উপর কার্য্য করে? যে বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আমারা ইহলোকেই দুঃখকে ভয় করি, ও সুখের অন্বেষণ করি, সেই একই বৃত্তির উপর কাজ করে,—সেই বৃত্তিটি কি?—না, কল্পনার দ্বারা উত্তেজিত আমাদের ঐন্দ্রিয়িক অনুভবশক্তি অর্থাৎ আমাদের সেই বৃত্তি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তনশীল, এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহার তারতম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পারলৌকিক সুখ ও দুঃখ, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা জ্বলন্ত অথচ চলন্ত দুইটি ভাবকে আমাদের অন্তরে, উত্তেজিত করে—সে দুইটি ভাব কি?—না, আশা ও ভয়। বয়স, স্বাস্থ্য, একখণ্ড চলন্ত মেঘ, সূর্য্যের একটি রশ্মি, এক পেয়ালা কাফি, এবং এইরূপ অসংখ্য পদার্থ—সমস্তই আমাদের আশা ও ভয়ের উদ্রেক করে। আমি এমন কতকগুলি লোককে জানি—এমন কি, এরূপ কতকগুলি দার্শনিক পণ্ডিতকে জানি, কোন কোন দিনে যাঁহাদের আশার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর ইহারই উপর কিনা নীতির ভিত্তি পত্তন করিতে হইবে! ফলত ঐ নীতিবাদ, মানব-আচরণে শুধু একটা স্বার্থের উদ্দেশ্য খাড়া করিতে চাহে—তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। কার্য্যের ফলাফল গণনা করিয়া আমি যে কাজ করি, সেই গণনা ঠিক্ হইতেও পারে; তাহার দ্বারা আমি খুব সুখেরও আশা করিতে পারি; কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কোন ন্যায়ের ভাব দেখিতে পাই না যাহা অবশ্য

কর্ত্তব্য বলিয়া কোন কার্য্য করিতে আমাকে বাধ্য করিতে পারে; অথবা এই গণনা করিতে পারা, কি না-পারার মধ্যে, কোন পাপ পুণ্যও দেখিতে পাই না, (যদিও প্যাস্কাল তাহা দেখিতে পান); ফল কথা, আমাদের অনুভবশক্তি ও কল্পনাশক্তির তারতম্য অনুসারে, আমাদের প্রত্যেকের মনে আশা ও ভয়ের তারতম্য হইয়া থাকে। শেষ কথা, পারলৌকি সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কারের আকারেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সব কর্ম্মই দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য যাহা আসলে ভাল কিংবা আসলে মন্দ। যদি ভাল মন্দ বলিয়া আসলে কোন জিনিস না থাকে, ভাল মন্দের যদি অবশ্য প্রতিপাল্য কোন নিয়ম না থাকে, তবে তাহাতে না-আছে পাপ, না-আছে পুণ্য; তাহা হইলে সে পুরস্কার পুরস্কারই নহে, সে দণ্ড দণ্ডই নহে; কেন না ভালমন্দের ধারণা হইতে তাহা মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয় না। যে স্থলে এই ভালমন্দের ধারণা নাই, সে স্থলে দণ্ড পুরস্কারের পরিবর্ত্তে শুধু সুখের আকর্ষণ ও যন্ত্রণার ভয় ধর্ম্মের অনুশাসন-বিধির সহিত যুড়িয়া দেওয়া হয় মাত্র; সে বিধির মধ্যে কোন ধর্ম্মনৈতিক ভাব নাই; তখন আবার আমরা সেই পার্থিব কায়িক দণ্ডবিধির ব্যবস্থায় ফিরিয়া আসি যাহা লোককল্পনাকে সন্ত্রাসিত করিবার জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং যাহা ব্যবস্থাকর্ত্তাদের প্রচারিত আইনের উপরেই নির্ভর করে; এইরূপে, এই পার্থিব দণ্ড পুরস্কারকে, বিধি ব্যবস্থাকে, আমরা পরলোকেও লইয়া যাই। আমরা পরে দেখিব—আত্মার অমরত্ব, উহা অপেক্ষা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত।

এই মিথ্যা ও অসম্পূর্ণ নীতিবাদগুলিকে অপসারিত করিয়া এমন একটি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইব, যাহা আমাদের মতে, সম্পূর্ণ সত্য; কেন না, ঐ সিদ্ধান্ত, নিশ্চিত তথ্য ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করে না, কোন তথ্যকেই উপেক্ষা করে না, এবং সেই সব তথ্যের যথাযথ লক্ষণ ও মর্য্যাদাও রক্ষা করিয়া থাকে।

বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা।

সৃষ্টিপ্রসঙ্গ।

মূল বেদান্তে এই দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি ও তাহার একটা ক্রম বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ক্রমটীই জানিবার ও বলিবার ইচ্ছা হয়;—হইলেও সে কথা পরে বলা যাইবে। বেদান্তশাস্ত্রে সৃষ্টির কথা আছে,ইহা শুনিয়া প্রথমতঃ ইহাই মনে হইতে পারে যে, বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা; সুতরাং তন্মতে আবার সৃষ্টি কি? এই অংশের প্রত্যুত্তরার্থ তন্মতের আচার্য্যেরা যাহা বলেন অগ্রে তাহাই বলা যাউক।

বেদান্তাচার্য্যেরা বলেন, বস্তুতঃই ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদয় পদার্থ মিথ্যা; যে কিছু দৃশ্য সে সমস্তই রজ্জুসর্পের ন্যায় ভ্রমদৃষ্ট। অপিচ, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মাই জীব নামে ব্যবহৃত হইতেছেন। সুতরাং এতন্মতে সৃষ্টি ও তাহার ক্রম, বন্ধ্যার পুত্রের নামকরণের সহিত সমান বলিয়া গণ্য হইতে পারে বটে; তথাপি তদুভয়ের বর্ণনা বা উপদেশ করা ব্রহ্মতত্ত্ব বুভুৎসুর পক্ষে হিতকর, বিশেষ হিতকর। যেমন কোন বালককে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইতে হইলে, তাহাকে প্রথমতঃ কিছু মিষ্ট দ্রব্য দেখাইতে হয়। নচেৎ সে কোনও ক্রমে তিক্ত ঔষধ সেবনে

ইচ্ছুক হইবে না। বালকের পক্ষে মিষ্ট দ্রব্য অপকারক, আর তিক্ত ঔষধ উপকারক হইলেও বালক আপনার বাল্যদোষে দূষিত হইয়া উপস্থিত রমণীয় মিষ্ট দ্রব্যকেই উপকারক ও দুঃসেব্য তিক্ত ঔষধকে অপকারক মনে করিতে থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বেদান্ত-বক্তারা বলেন যে, চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান সুখকর জগতের মিথ্যাত্ব প্রভৃতি স্বীকার ও তাহাকে বুদ্ধ্যারোহিত করা অজ্ঞান দোষে কলুষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। ইহাদের তাদৃশ হৃদয়ে জগতের সত্যতা পক্ষই নিত্যারূঢ় রহিয়াছে সুতরাং তৎপক্ষেরই যুক্তি প্রভৃতি তাহাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানোৎপত্তি হওয়ার বাধা উত্থাপন করে। অতএব, অজ্ঞ হৃদয়ে নির্গুণ নিরাকার নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম সহজে উদিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই জননীর ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতি প্রথমতঃ জগতের সত্যত্ব মানিয়া লইয়া সৃষ্টি ও তাহার ক্রম উপদেশ করিয়াছেন। মরুমরীচিকায় জলভ্রম হইলে, যাবৎ না ঐ ভ্রান্তিকল্পিত জলের তথ্য বিদিত হওয়া যায়, তাবৎ ঐ জলকে কোনও ক্রমে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে না। সত্য বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু যখন অনুসন্ধান দ্বারা ঐ ভ্রান্তিকল্পিত জলের তথ্য জানা যায়, তখন আর তাহার সত্যতা থাকে না। তখন বুঝা যায় যে, ঐ জল মিথ্যা বা ভ্রান্তিকল্পিত। সে জল তখন মরীচিকাতেই পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং যাহা সত্য তাহাই তৎকালে প্রকাশমান হইতে থাকে। এইরূপ, যতকাল পরব্রহ্মে পরিকল্পিত এই জগতের মূল তথ্য অনুসন্ধানের গোচরে আসিবে ও সম্যক্ জ্ঞানের গোচর হইবে, ততকাল অসৎ হইলেও সৎরূপে প্রতীত হইবে। অনুসন্ধানাদির দ্বারা যখন ইহার প্রকৃত তথ্য বিদিত হওয়া যাইবে তখন অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় ইহার মূল বিনষ্ট হইবে অর্থাৎ তখন আর ইহার সত্যতা থাকিবে না। তখন ইহাকে সৎ বলিয়া বোধ হইবে না, পরন্তু মিথ্যা বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। তখন কেবল পরম সত্য ব্রহ্মই প্রকাশমান থাকিবেন, আর সব মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইবে। অতএব, এই জগৎ মূলতঃ মিথ্যা হইলেও, ইহার প্রতীয়মান সত্যতা মানিয়া লইয়া, স্বীকার করিয়া, সৃষ্টি ও তাহার একটা ক্রম প্রদর্শন করা যোগ্য বৈ অযোগ্য নহে। বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টি ও তাহার ক্রম বর্ণন কেবল হইল মিথ্যাত্ব প্রদর্শন জন্য, অন্য কোন উপযোগের জন্য নহে। অতএব, ব্রহ্মাদ্বৈত উপদেশ প্রস্তাবে সৃষ্টি ও তাহার একটা ক্রম বর্ণন করা অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপযোগী নহে। প্রত্যুত তাহার প্রকৃতোপযোগিতা সুস্পষ্ট। অপিচ, অজ্ঞান নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার-দশায় জগৎকে সত্য বলা যায়, এবং তদন্তে ইহাকে বাধ্য হইয়া অসত্য বা মিথ্যা বলিতে হয়। এইরূপে একই জগতের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব উভয় ভাব অবিরল হইতেছে। উপদিশ্যমান সৃষ্টি যে কতকাল পূর্ব্বে হইয়াছে, তাহা অনির্ণেয় অর্থাৎ নির্ণীত হইবার নহে। বেদান্তাচার্য্যেরা সামান্য একটি কল্পনাকে কল্পনা করিয়া এইমাত্র বলেন যে, সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি।

এস্থানে এমন কথা উঠিতে পারে যে, যখন সকল বস্তুরই আদি দেখিতেছি, তখন সৃষ্টিও আদি অর্থাৎ এক সময়ে ইহা ছিলনা, পরে হইয়াছে। এ কথার প্রত্যুত্তরে বেদান্তবাদীরা বলেন, উক্ত অনাদি শব্দের তাৎপর্য্যার্থ অন্যবিধ। সৃষ্টি, স্থিতি,

লয়, পুনঃ সৃষ্টি, পুনঃ স্থিতি, পুনঃ প্রলয় মহাপ্রলয়, এইরূপ যে ধারা বা প্রবাহ, সেই প্রবাহটাই অনাদি; প্রতিবিম্বরূপ ইহার অনাদিত্ব প্রমাণসহ নহে। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল নামধেয় মায়া বিশেষ দ্বারা মিথ্যা ও কৌতুকাবহ পদার্থরাশি স্থাপন করে, করিয়া দর্শকদিগের ঔৎসুক্য নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল মায়া-সৃষ্ট পদার্থরাশির উপসংহার করে; সেই-রূপ,পরম ঐন্দ্রজালিক ঈশ্বরও অচিন্ত্যশক্তি স্বমায়ারদ্বারা এই জগৎ সৃজন করেন, জীবগণের সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ প্রদানান্তে পুনর্ব্বার ইহাকে উপসংহৃত করেন। সেই উপসংহারের নাম প্রলয়।

বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় প্রলয় চারিপ্রকার। নিত্য, প্রাকৃত, নৈমি-ত্তিক ও আত্যন্তিক। এই যে জনগণের প্রাত্যহিক সুষুপ্তি, অর্থাৎ নিঃস্বপ্ন নিদ্রা, বেদান্তীরা বলেন, এই সুষুপ্তি নিত্য প্রলয় বলিয়া গণ্য। কেননা সুষুপ্তি কালেও কোন পদার্থের দর্শন থাকে না, সমস্তই লীন বা লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং সুষুপ্ত জীবের পক্ষে সুষুপ্তিও প্রলয়পদাভিধেয় হইতে পারে।

অত্যন্ত নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির ঘট প-টাদি বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান থাকে না। সেই জন্য সুষুপ্তিনামক অবস্থাকে দৈনন্দিন প্রলয় ও নিত্য প্রলয় বলা হয়। এই নিত্য প্রলয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার ও লিঙ্গশরীর প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ কারণরূপে স্থিত থাকে, আর সকল প্রলয়গত হইয়া যায়। পরন্তু এই নিত্য প্রলয়ের বা সুষুপ্তির পরেই আবার পূর্ব্বোক্ত সংসার দর্শন হইতে থাকে। সেইজন্য এই দৈনন্দিন প্রলয় প্রলয় বলিয়া অনুভূত বা গণ্য হয় না।

জীবদিগের জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রত্যহই ভোগ হয়, তন্মধ্যে সুষুপ্তি অবস্থাই উৎকৃষ্ট। কেননা, এই অবস্থায় জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই সময়ে কেবলমাত্র সত্যা-নন্দের কিঞ্চিদংশ অনুভূত হইতে থাকে, অন্যকিছু অনুভূত হয় না।

ব্রহ্মার লয় জনিত কার্য্যমাত্রের বিল-য়কে প্রাকৃত লয় কহে। এই লয়ের ক্রম এইরূপ। যিনি অতি কঠোর তপস্যা-দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাধিকারী অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ঐরূপ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া ব্রহ্মত্ব পদ পাইবার পূর্ব্বেই হউক, আর পরেই হউক, তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত করি-য়াছেন, তিনি উক্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ অর্থাৎ ব্রহ্মত্বপদ অনুভবের অন্তে, বিদেহ-কৈবল্য নামক পরমামুক্তি প্রাপ্ত হন। তৎকালে এই ব্রহ্মার অধিকৃত ব্রহ্মলোকে যত ব্রহ্মজ্ঞ অবস্থান করিতে থাকেন, তাঁ-হারও ব্রহ্মার সহিত একসঙ্গে মুক্ত হন। এই ব্রহ্মাকে কার্য্যব্রহ্ম ও তাঁহার ঐ মুক্তিকে কার্য্যব্রহ্মবিলয় কহে। কার্য্য-ব্রহ্মার লয়ে তাঁহার অধিকৃত ব্রাহ্মাণ্ডের মূলমায়ার লয় হইয়া থাকে এবং এই লয়কে মহাপ্রলয় সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অপিচ মায়াত্মিকা প্রকৃতিতে লয় হও-য়ায় প্রাকৃতিক প্রলয়ও বলা হয়। পূ-র্ব্বোক্ত কার্য্য-ব্রহ্মার দিনাবসানে নৈমি-ত্তক ত্রৈলোক্যের লয়কে সেই সেই নৈমি-ত্তিক প্রলয়ও বলিয়া থাকেন। কার্য্যব্রহ্মা আপন দিনের অবসানে আবার ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়া শয়ন করেন, আবার দিনরাত্রির অবসানে পুনরপি সৃষ্টি করেন। এ সৃষ্টিও পূর্ব্ববৎ। ব্রহ্মার দিনরাত্রির পরি-মাণ অল্প নয়। আমাদের হিসাবে চতুর্যু্গ সহস্র পরিমিত কালে ব্রহ্মার এক দিন। আর ঐরূপ কালে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া

থাকে। ব্রহ্মার তাদৃশ রাত্রে এই লোক-ত্রয়ের কিছুই থাকে না। এতদ্‌দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মহাপ্রলয়ের স্থিতিকাল কি পরিমাণ।

ব্রহ্মজ্ঞান নিমিত্তক পরমামুক্তিকে বেদান্তাচার্য্যেরা অতিরিক্ত মুক্তি বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা সংসারের মূল কারণ মূল-অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে তৎসংক্রান্ত সংসার-স্থিতির বা পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা কি?

প্রলয়ের ক্রম এই যে, প্রথমতঃ পৃথিবীর লয়কাল; জলের লয় তেজে, তেজের লয় বায়ুতে, বায়ুর লয় আকাশে, আকাশের লয় জীবের মহত্তসারে, তাহার লয় সমষ্টি জীবাভিমানী হিরণ্যগর্ভের মহত্তসারে এবং তাহার লয় মূল অজ্ঞানে হয়। কারণে কার্য্যের লয়, এই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্যান্য পদার্থেরও লয় ক্রমে কল্পনা করিতে হয়। বেদান্তবাদী মুনিঋষি ও আর্য্যগণ এইরূপ লয়ক্রম উপদেশ করিয়াছেন এবং বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থেও এইরূপ ক্রম বর্ণিত হইয়াছে।

বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দ।

দুই দিকে আকর্ষণ। এক দিকে সংসারের সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ—অন্য দিকে ধর্ম্মের সুখ। আমরা এই দুয়ের মধ্যস্থলে। দুই দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।

ঘোর বৈরাগী মনে করেন, সাংসারিক সুখ ঘৃণিত, পরিত্যাজ্য। তাঁহার মতে সাংসারিক সুখ মুক্তিপথের অন্তরায়। যত সাংসারিক সুখ ভোগ করিবে, ততই ধর্ম্মকে হারাইবে। ঘোর বৈরাগীর মতে সংসার নরক।

এ বিষয়ে সত্যধর্ম্ম কি বলেন? ধর্ম্ম বলিতেছেন, এ কথা কখনই সত্য নহে। ধর্ম্ম সংসারের সহায়। ধর্ম্ম সংসারের উন্নতি সাধন করেন। ধর্ম্ম বলিতেছেন, বৈধ ভোগে দোষ নাই, উহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরমেশ্বর জীবের জন্য ইহসংসারকে অসংখ্য প্রকার সুখের উপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্ম, সাংসারিক সুখ ইন্দ্রিয়সুখের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি যেমন প্রকৃত ভাবে সাংসারিক সুখ ভোগ করিতে পারেন, সেরূপ অন্য লোকে পারে না।

ভগবদ্ভক্তের নিকট এক গুণ সাংসারিক সুখ, শত গুণ হয়;—এক গুণ পারিবারিক সুখ শত গুণ হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দের মধ্যে যে সুখ রহিয়াছে, জগতের অসংখ্য জীব তাহা কেমন সম্ভোগ করিতেছে! কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, তাহাতে শত গুণ, সহস্র গুণ, অধিকতর সুখ, অধিকতর আনন্দ সম্ভোগ করেন।

ভগবদ্ভক্ত জগতের রূপ সকলের মধ্যে তাঁহার প্রভুর আনন্দরূপ দর্শন করেন, রসের মধ্যে তাঁহার আনন্দরস পান করেন, গন্ধের মধ্যে তাঁহার পবিত্রতার আঘ্রাণ প্রাপ্ত হন, স্পর্শের মধ্যে ব্রহ্মস্পর্শসুখ ভোগ করেন, শব্দের মধ্যে তাঁহার নীরব বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন।

সুন্দর বস্তু দেখিয়া কে না সুখী হয়? কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, সকল সুন্দর পদার্থের মধ্যে, সেই নিরবদ্য সৌন্দর্য্যসারের নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হন। সুরস সামগ্রীর আস্বাদ লইয়া কে না সুখী হয়? কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, তাহাতে তাঁহার প্রেমাস্পদের প্রেমরসের আস্বাদ পাইয়া আনন্দিত হন। সুগন্ধ পদার্থের আঘ্রাণ লইয়া কে না সুখানুভব করে? কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, তাহার মধ্যে সেই পবিত্র

পুরুষের পবিত্রতার আভ্রাণ পাইয়া ধন্য হন। স্পর্শসুখে কে না সুখী হয়? কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, তাহার মধ্যে ব্রহ্মস্পর্শ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হন। মধুর শব্দলহরী শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিলে কে না আনন্দিত হয়? কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাহার মধ্যে তাঁহার প্রেমাস্পদ পরম দেবতার মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে পূর্ণ হন।

ইন্দ্রিয়সুখভোগে যেমন, সাংসারিক সম্বন্ধজনিত সুখেও সেইরূপ। স্বামী স্ত্রী, মাতা পিতা ও সন্তান; বন্ধুতা ও আত্মীয়তা; এই সকল সম্বন্ধ হইতে যে সুখামৃত নিঃসৃত হয়, তাহা কে না ভোগ করে? এই সকল পারিবারিক ও আত্মীয়তাজনিত সুখে জগৎ বিমোহিত।

কিন্তু এই সকল সুখ, শতগুণ বর্দ্ধিত আকারে, ভগবদ্ভক্তকে আলিঙ্গন করে। তাঁহার নিকটে দাম্পত্য, বাৎসল্য, বন্ধুতা, আত্মীয়তা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, এই সকলই প্রেমময়ের প্রেমলীলা,—সেই পূর্ণ প্রেমস্বরূপের প্রেমের প্রকাশ। আমাদের একটী সঙ্গীতে আছে;—

> "এক ভানু অযুত কিরণে,
> উজলে যেমতি সকল ভুবন,
> তোমার প্রেম হইয়া শতধা,
> বিরচয়ে সতীর প্রেম,
> জননী হৃদয়ে করে বসতি।"

কিন্তু সাংসারিক সুখ, বিষয়সুখ ভোগে কি দোষ নাই? আছে বই কি? আসক্ত হইলেই দোষ। যে পরিমাণে সাংসারিক সুখে আসক্তি, সেই পরিমাণে আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্যুতি।

জগতে এমন সহস্র সহস্র লোক আছেন, বিষয়সুখই তাঁহাদের লক্ষ্য, ধর্ম্ম তাহার উপায় মাত্র। বিষয়সুখের জন্য ধর্ম্ম। ধর্ম্মের আদেশে বিষয় সুখ ভোগ নহে। তাঁহারা উপাস্য দেবতাকে বলেন, "ধনং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।" তাঁহারা বিষয় বাসনা ও বিষয় ভোগকে স্বর্গে পর্য্যন্ত লইয়া যান। তাঁহারা আশা করেন যে, এখানে অবৈধ ইন্দ্রিয় সুখ ও পানাদি হইতে বিরত থাকিলে স্বর্গে সুরা অপ্সরা মিলিবে। তাঁহারা পৃথিবীর ময়লা, এখানকার দুর্গন্ধ, স্বর্গ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে চান।

ধর্ম্মের সুখ, ব্রহ্মসহবাসের সুখ, যিনি লাভ করিয়াছেন, আর কিছুতেই তাঁহার স্পৃহা থাকে না। সাংসারিক সুখ হয়, ভাল, না হয়, ক্ষতি নাই। না হইলে তিনি তজ্জন্য কাতর হন না। অন্তরে যাহা পাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি পূর্ণ। মূল-ধন সঞ্চিত আছে, অন্য ক্ষতিতে তিনি কাতর নহেন। সাংসারিক সুখ হয়, ভাল, না হইলে কোন চিন্তা নাই। ভিতর পূর্ণ আছে।

বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ভগবদ্ভক্তের অবস্থা দেখিয়াছি। ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইয়া আসিতেছে, বাহিরের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইতেছে। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ভিতরে ক্রমশঃই ব্রহ্মানন্দের উন্নতি। বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ হ্রাস হই-তেছে বলিয়া বাহিরে সুখ ভোগের শক্তি ক্রমে কমিয়া যাইতেছে বলিয়া, তিনি দুঃখিত নহেন। অন্তরে আনন্দ ক্রমশই বাড়িতেছে। তিনি বিষয়ভোগে নিস্পৃহ। তাঁহার দেহ ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতেছে; এক দিন নষ্ট হইয়া যাইবে। তজ্জন্য তিনি দুঃখিত নহেন।

তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখিতেছেন যে, যখন এ দেহ নষ্ট হইবে, তখন বিদেহী হইয়া পূর্ণ মাত্রায় ব্রহ্মানন্দ রস পান করিবেন।

যখন দেহ-পিঞ্জর ভগ্ন হইবে, তখন জীবাত্মা পক্ষী মুক্ত হইয়া ব্রহ্মাকাশে পরমানন্দে উত্তীর্ণ হইবে।

আমি বলিয়াছি যে, ধর্ম্মানুগত বিষয় ভোগে দোষ নাই। কিন্তু বিষয়সুখলাভ করিয়া ধর্ম্মকে কখন ভুলিও না। বিষয়-সুখে আসক্তি থাকিলে, পরমাত্মাকে জানা যায় না।

কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে প্রাচীন আর্য্য ঋষি, এ বিষয়ে কেমন সুন্দর উপদেশ দিতেছেন! নচিকেতা যমরাজের নিকট আত্মবিদ্যা শিক্ষার বর প্রার্থনা করিলে, যমরাজ বলিলেন উহা বড় কঠিন, তুমি শিক্ষা করিতে পারিবে না। এ বরের পরিবর্ত্তে, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।

"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ,

শতায়ু বিশিষ্ট পুত্রপৌত্ররূপ বর গ্রহণ কর।

"বহূন পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্"

বহু পশু হস্তী হিরণ্য ও অশ্বসকল গ্রহণ কর।

"ভূমের্মহদায়তনং বৃনীষ"

মহদায়তন ভূমি বর প্রার্থনা কর। অর্থাৎ রাজত্ব গ্রহণ কর এই সকল কথা শুনিয়া নচিকেতা বলিলেন,-

"সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং জরয়ন্তিতেজঃ"

এই সকল বিষয়ভোগের দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ নষ্ট হয়।

ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ

বিত্তের দ্বারা মনুষ্য কখন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।

নচিকেতা রাজ্যাদি ভোগ অস্বীকার করিলেন। যমরাজের নিকট আত্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রার্থনা করিলেন। তখন যমরাজ নচিকেতাকে আত্ম-বিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই উপাখ্যানে প্রাচীন মহর্ষি এই উপদেশ দিতেছেন যে, যে ব্যক্তির বিষয়-লালসা দূর হয় নাই, সে আত্মতত্ত্ব, পরমাত্ম তত্ত্ব শিক্ষা করিবার অধিকারী নয়। এক দিকে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি অপরদিকে পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য, ইন্দ্রিয়সুখদ সামগ্রী সকল; ইহার মধ্যে যাঁহার চিত্ত, পার্থিব সুখের দিকেই ধাবমান, তিনি কখন প্রকৃত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু নহেন। তিনি পার্থিব সর্ব্বপ্রকার সুখকে তুচ্ছ করিয়া সেই এক পরম বস্তুর অন্বেষণ করেন। যিনি সাংসারিক সুখের জন্য লালাইত, তিনি আত্মতত্ত্ব,পরমাত্মতত্ত্ব, শিক্ষার অধিকারী নহেন। নচিকেতো-পাখ্যানে মহর্ষি কৌশল করিয়া এই মহা-মূল্য উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

যেমন ধর্ম্মানুগত হইয়া বিষয়সুখ ভোগ করিবে, সেইরূপ, ধর্ম্মের আদেশে, বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। যদি ধর্ম্ম আদেশ করেন, ঐ ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়, ঐ বিষয় সম্পত্তি ছাড়, তখন তাহা হাসিতে হাসিতে ছাড়িতে পার কি না? ধর্ম্মের আদেশে বিষয়ভোগ করিবে। আবার ধর্ম্মের আদেশে সকলই ছাড়িতে প্রস্তুত থাকিবে।

বিষয় সুখই যাহাদের লক্ষ্য, ধর্ম্ম তাহাদের উপায় মাত্র। তাহদের নিকট ধর্ম্ম বড় কঠোর, বড় তিক্ত। বিষয়সুখের ক্ষতি হইলে, তাহারা ধর্ম্মকে, আর ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরকে দোষ দেয়।

কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধু, সহস্র কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়াও কি বলেন? "প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ্ যা হয়, হউক; কিন্তু তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" সাধু লোক-দিগের, মহাত্মাদিগের জীবন দেখ। তাঁহারা সহস্র প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও,

প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন, তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করেন।

ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে, যদি বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিতে হয়, ভগবদ্ভক্ত তাহা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ধর্ম্মের জন্য, যদি আত্মীয় স্বজন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট, বিরক্ত হন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতেও বা তিনি কি করিবেন? ধর্ম্মের জন্য তিনি সকলই সহ্য করিতে প্রস্তুত। তখন, ভগবানের দাস, বলেন ;—

"যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্,
শুনে চলি তোমারই ডাক্।"

স্বার্থত্যাগ ভিন্ন, কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করা ভিন্ন, ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় না। তাঁহার জন্য যত বিষয় সুখ ত্যাগ করিবে, সেই পরিমাণে, সেই পরম সুখ লাভ করিতে পারিবে। ধর্ম্মের জন্য যত অনিত্য অসারকে ত্যাগ করিবে, তত সেই নিত্য ও সার পদার্থকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যত ছায়াকে ছাড়িবে, তত সেই ধ্রুব সত্যকে পাইবার উপযুক্ত হইবে।

হে পূর্ণানন্দ পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া যাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে, আপনার হৃদয়রঞ্জন মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে, সে কি আর কিছুতে ভুলিতে পারে? যে তোমাকে কখন দেখে নাই, সেই সংসারমোহে বিমুগ্ধ হইয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে। তোমার যিনি যথার্থ ভক্ত, তিনি তোমাকেই চান, তোমাকেই চান, তোমাকেই চান। সংসারে এমন কি আছে যে তোমার ভক্তকে ভুলাইতে পারে? অকিঞ্চিৎকর অসার, নশ্বর, মলিন বিষয়সুখ কি তোমার প্রকৃত ভক্তকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে? তোমার ভক্ত, সকলের মধ্যে তোমাকে, এবং তোমার মধ্যে সকলকে দর্শন করেন। সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগে সুস্থতায়; হাস্য, ক্রন্দনে, আলোকে, অন্ধকারে; বিচ্ছেদে, মিলনে, সকল অবস্থায়, তিনি তোমারই হইয়া থাকেন। তিনি তোমার দাস; তোমার দাসানুদাস। তোমার স্মরণে, চিন্তনে, ধ্যানে, গুণকীর্ত্তনে তোমার ভক্ত যে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন, কোন প্রকার সাংসারিক সুখের সহিত কি, তাহার তুলনা হয়?

"বিপদরাশি দুঃখ দারিদ্র্য কি করে?
যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে।"

তুমি তোমার ভক্তের নিকট এক গুণ পার্থিব সুখ শতগুণ করিয়া দাও। তুমি তোমার ভক্তকে, নিজে হস্ত ধারণ করিয়া অনন্ত আনন্দ পথে লইয়া যাও। অনন্ত জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ, যোগানন্দ, ব্রহ্মানন্দ তুমি তোমার ভক্তের জন্য রাখিয়া দিয়াছ।

"তুমি যারে কর হে সুখী,
সেই সুখী হয়, এসংসারে;
বিপদ প্রলোভনে, নাথ, তার কি
করিতে পারে?"

তোমাকে ভুলিয়া
কি বিষয়সুখে মজিব?
কাচখণ্ডের বিনিময়ে অমূল্য
কোহিনুরে বঞ্চিত হইব?

হে আনন্দময়! চিরদিন তুমি আমার সর্ব্বস্বধন হইয়া থাক। আমার তৃষিত চিত্ত আর কিছু কখন যেন না চায়। হে প্রভো! তোমার চরণামৃত পানেই যেন আমার প্রাণের তৃষ্ণা নিবারিত হয়। আত্মার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তোমার কৃপাপ্রদত্ত সত্যান্ন, ও প্রেমান্ন ব্যতীত আর কিসে শান্ত হইবে। হে প্রভো! আর কিছু চাহিনা।

"তব চরণামৃত, পানপিপাসিত,
নাহি চাহি ধন জন মানে।"

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

সেখ সাদি।

সন্তোষ।

আমি সন্তোষ চাই। সন্তোষের মত ধন আর কি আছে। যাহার সহিষ্ণুতা নাই, সে কিসের জন্য জ্ঞানের গর্ব্ব করে?

একজন দরিদ্র সাধু, রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, আপনি রাজ্যলাভ করিয়াছেন, আর আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি অতি দীন, লোকে আমাকে মাড়াইয়া চলুক, তাহাতে কি? আমি আপনার মত কণ্টক নহি, যে অপরের পায়ে ফুটিব।

একজন সাধু তাহার ছিন্ন কন্থা সেলাই করিতেছিল। তাহা দেখিয়া অপরে বলিল; নিকটে একজন দাতা আছেন, চলুন, তিনি এখনই আপনাকে নূতন বস্ত্র দান করিয়া ধন্য হইবেন। সাধু বলিল নিজের দারিদ্র জানাইয়া অপরের নিকট ভিক্ষা করিতে চাহি না। ছিন্ন কন্থাতেই আমি সন্তুষ্ট; কেন ধনীর নিকট ভিক্ষা করিতে যাইব? অপরের সাহায্যে স্বর্গগমনেও আমি নরকের যন্ত্রণা অনুভব করি।

চিকিৎসক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত; কিন্তু রোগীর স্বাস্থ্য, পথ্য ও নিয়মের উপর নির্ভর করে।

দেখিতেছি আহারে তোমার সংযম শক্তি একগাছি কেশ অপেক্ষাও ক্ষীণ; কিন্তু তোমার ঔদারিকতার প্রভাব লৌহ-রজ্জু ছিন্ন করিতেও সক্ষম।

আহারের উদ্দেশ্য কি—জীবিত থাকিয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করা। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া মনে হয় আহারের জন্যই জীবন।

পরিমিত আহার তোমাকে ধারণ করিয়া রাখিবে। কিন্তু অপরিমিত আহার তোমাকে বহন করিতে হইবে।

যিনি সংযমী, তিনি সর্ব্ববিধ কষ্টভোগ করিতে সমর্থ; কিন্তু বিলাসী কষ্টে পড়িলে আশু-মৃত্যু তাহার সুনিশ্চিত।

ভিক্ষার লাঞ্ছনা অপেক্ষা উপবাস করা বরং ভাল। যদি অন্তরের কষ্ট জানাইতে হয়, তাহার নিকট গিয়া বল, যাহার প্রসন্ন বদন হইতে তুমি সান্ত্বনা প্রত্যাশা করিতে পার।

সিংহ ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেও সে কুকুরের ভোজনাবশিষ্ট খাইতে চায় না। ক্ষুধিত হইলে তুমি নীচের নিকটে প্রার্থনা জানাইও না।

মূল্যবান বেশ পরিহিত অপদার্থ লোক, আর স্বর্ণ-মণ্ডিত কর্দ্দম-প্রাচীর, উভয়েরই মূল্য এক।

অপরের প্রসাদভোজী অপেক্ষা যিনি নিজ পরিশ্রমে জীবিকা আহরণ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বর, যিনি ষড় ঋতুর প্রবর্ত্তক, তিনি প্রত্যেক প্রাণীর প্রয়োজন যথাযোগ্য বিধান করিতেছেন। বিড়ালকে যদি তিনি পক্ষ দিতেন, একটি পক্ষীরও ডিম্ব রক্ষা পাইত না। যিনি তোমাকে দরিদ্র করিয়াছেন, তিনি জানেন, কোন্ অবস্থা তোমার পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

মরুদেশ-যাত্রী ক্ষুৎপিপাসা-কাতর ওষ্ঠাগত-প্রাণ জনৈক পথিক, পথে যাইতে যাইতে একটি থলিয়া পাইল। আহার্য্য সামগ্রী পরিপূর্ণ মনে করিয়া সহর্ষে খুলিয়া দেখে উহা মণি-মুক্তায় পরিপূর্ণ। তখন তাহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। হায়, ক্ষুধার্ত্তের নিকটে ধূলিমুষ্টি আর স্বর্ণখণ্ড উভয়ই এক।

আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় নিত্য তৃপ্ত। কিন্তু এক সময়ে জুতার অভাবে আমার বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল। সেই সময়ে এক দিন মস্‌জিদে গিয়া দেখি একজনের পা নাই। তখন নিজের প্রতি ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিয়া তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিলাম। সে দিন হইতে জুতার অভাব আর অনুভব করি না।

ঊর্দ্ধে হাত দুইখানি তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় কি হইবে, যদি যথাযোগ্য পাত্রে দানের সময় সে হস্ত প্রসারিত না হয়।

সদ্বংশজাত দারিদ্রে নিপতিত হইলেও তাহার মহত্ত্ব বিনষ্ট হয় না।

চোর সাধুকে বলিয়াছিল, অপরের নিকট মুষ্টি ভিক্ষা করিতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না। সাধু বলিল চৌর্য্যাপরাধে রাজদণ্ডে হস্ত বিচ্ছিন্ন হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষা প্রশংসনীয়।

নিরবচ্ছিন্ন বলের দ্বারা সৌভাগ্য লাভ হয় না।

বিদেশ যাত্রায় সুখলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ব্যবসায়ী, যাহার অর্থের অভাব নাই, অরণ্য পর্ব্বত মরুভূমি সকল স্থানেই তিনি সুখে সঞ্চরণ করিতে পারেন। যিনি বিদ্বান, স্বর্ণ মুদ্রার ন্যায় বিদেশেও তাঁহার সমাদর; তিনি কিছু আর ধনীর সন্তানের ন্যায় নহেন, যে নোটের মত দেশের ভিতরেই তাহার সমাদর ও প্রচলন। সুন্দর যুবা, পিতৃমাতৃতাড়িত হইলেও বিদেশে সে সম্মান ও আশ্রয় লাভ করে। সুকণ্ঠ গায়ক, তাহার বীণা লইয়া বিদেশে গিয়াও অপরকে বিমুগ্ধ করে; সেখানে তাহার সম্মানের অভাব কি। সামান্য শিল্পী বিদেশে যাইলেও তাহার উদরান্নের অভাব ঘটে না।

সমুদ্র মহা ভীষণ হইলেও (water fowl) সমুদ্র বিহারী-পক্ষী বারিধি-বক্ষে বিরাম লাভ করে। কিন্তু

উহার তরঙ্গের তাড়নে প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডও তীরে উৎক্ষিপ্ত হয়।

মক্ষিকা দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিলে প্রকাণ্ড হস্তীকেও তাহারা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে—সিংহের চর্ম্মও তুলিয়া লইতে পারে।

শত্রু, মিত্র সাজিয়া দংশন করিলে, সে দংশন অতীব সাংঘাতিক।

অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ত হইবেই; তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।

লোভ পরিত্যাগ কর, রাজার ন্যায় স্বাধীন হও, তাহা হইলেই তোমার মনের সন্তোষ মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

PRAYERS FROM THE BOOK OF VYAKHYAN

VI

O Lord most high, Thou art our stay and comfort. Thou art our Treasure, our only Friend. Thou art our Father and Thou art our Mother. Do Thou exalt our love to Thee and so ordain that all inclinations and affections of our mind may follow the spirit of goodness that is of Thee. All our strength we have derived from Thee, may we devote it to Thy service. In whatever direction our work may lie, may we there behold Thy eyes fixed upon us. O Supreme Spirit, lead us to Thy path of truth and purity and reveal Thyself to our eyes of faith. We have no other prayer to offer.

VII

O Spirit Supreme, Soul uncreate, Thou dwellest in our soul and rulest it as Thou rulest the universe. To every creature living under Thy protection Thou hast assigned its proper vocation. He who loveth to do thy work doeth work that is holy. He who hath seen the glory of Thy countenance—the beneficence of thy handiwork never dreams of severing himself from Thee. The littleness of his own self, so addicted to evil doing, becomes repulsive to him and the lofty sublimity of Thy being reveals its beauty to his eyes and draws him to Thee. I look within at my soul, so prone to evil, and my heart is filled with penitence; but when I contemplate Thy holiness, my heart is sanctified. My soul is mortified when it thinks of its ever-recurring sorrows and miseries, but my heart rejoiceth when it beholds the light of Thy countenance. O Lord my God, Thou art our all. When we discern Thy hand and understand Thy truth and strive to attain Thy goodness, even in the minutest degree, we feel exceeding joy. Everlasting is the union of the soul with Thee. Dwelling in our hearts, Thou speakest in Thy still small voice, ceaselessly dost Thou impart to us such counsel as may conduce to our present good and future happiness. What need have we to obey other voice, when it is Thou that speakest in accents sweet and pure? Why should we not listen, rapt in silence, to those words of truth and goodness, when it is Thou who utterest them and instillest them into our understanding. Should we not keep our ears turned to the direction from which Thy voice proceeds? At every step of our life dost Thou impart unto us Thy commandments, and whenever we stumble Thou dost strengthen our souls with the strength of righteousness, hence are we enabled to stand erect, else, like a stick unsupported, we must have been levelled to the dust. Whatever be the commandments that Thou layest upon us, they are to be laid to heart and whatever be the work which Thou commandest us to do, it is our bounden duty to perform. Forsake us not, O God my Lord, in this terrible world abandon us not. We seek Thy shelter, we place ourselves under Thy protection, take us, O take us unto Thy lap as the mother takes up her children,

Danger and difficulties beset us; the din of the world tends to estrange us from Thee—Do Thou, who art all-merciful, protect us and so ordain that nothing can separate us from Thee. Grant, O Lord, that we may devote ourselves to Thy work as long as life remains, in the full assurance that Thou art ever with us' as our Father and our Mother—Santih—Santih

VIII

O Lord our God, draw us unto Thee. What need have we to pray to Thee for worldly possessions? All the day long, all the night through, it is Thy mercy that nourishes our body and mind. It is from Thy hand that prosperity and adversity, joy and sorrow, reward and punishment come to us and contribute to our well-being and advancement. From the moment we were born Thou hast showered Thy mercy arround us without stint. What shall we then pray for to Thee? Let Thy will be done, for that alone is good that Thou dost will. Let Thy will be done that peace and good-will may reign over the world for ever and evermore. We know not what conduces to our welfare and what to our misery—only this we know that to obtain Thee is the highest good attainable by man. If the renunciation of all wealth and possessions, all honour and rank and even life-itself be the way to obtain Thee, such renunciation must be the greatest good for us; but if forsaking Thee be the way to the throne of the monarch of the world, no evil can be greater then such a consummation. When Thou comest to our heart we obtain all the good in the world. Therefore we pray to Thee for only one boon—the boon of the light of Thy countenance. We call unto Thee saying "আবিরাবীর্মএধি" reveal Thyself to us, remain in our heart, abide in it as its Lord—and do then take us unto Thyself. Our vision is fixed neither on the earth nor on the heaven but on Thee alone. Thee only do we behold and Thee only do we covet. Our heart yearns for Thy company, and for Thy words of comfort and consolation; come and dwell in this broken heart, and descend to this poor cottage of our bodily frame. We have no hope that our powers will avail us much, we have no strength of our own, and we can not do much for Thy sake. Thy mercy is our all. Thou art our all. Enclose us within Thy embrace; grant us protection under the shadow of Thy feet, bring us within the sphere of Thy love, and deliver us from all misery and affliction.

Whenever, O God, I have prayed to Thee, Thou hast heard my prayer. On the lofty mountain-top have I beheld Thee and when in the heart of the desolate forest I have sought Thee longing, Thou hast even then shed on my heart the cooling waters of Thy peace. Whenever I pray to Thee in this holy temple dedicated to Thy worship, Thou manifestest Thyself to me: I perceive that Thou seest my heart, that Thine eyes of love are fixed on my eyes. Inaccessible art Thou to these material eyes of mine; the eye of the soul, the eye of wisdom can alone behold Thee. What my eyes now thirst for is the dust of Thy feet, imprinted on the faces of Thy devout worshippers, the faces glowing in the ecstacy of love and adoration. And my ears are eager to hear Thy deep solemn voice, the voice that issues in the stillness of the night from the billions of stars travelling in their orbits and kept in majestic order in their spheres by law immutable. In my mind's eyes I obtain glimpses of Thy goodness. Wherever I turn, the pure love of the devoted constant wife—the disinterested, unwavering affection of the mother and the sincere attachment of the friend are now clearly brought home to my understanding as reflections caught from Thy supreme Goodness.

O Lord my God, grant that I may be privileged to behold Thee to the end of my days and when departing from this life I wake up in Thy new kingdom, may I have the power to sing again Thy glory, to offer Thee the gift of my tears of love and to do the works that Thou lovest.

Brethern, our hearts are now full, let us all jointly pray to Him.—

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়। আবিরাবীর্মএধি রুদ্র যত্তে
দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

Lead us, O Lord, from the false to the true, lead us from darkness unto light, from death unto immortality. Thou who art the

source of all light, reveal Thyself unto us. O Thou dread Lord, may Thy benign countenance protect us for ever and ever.

Santih—Santih.

নানা কথা।

ধূমকেতু।—পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বদাই আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিপথে অনেক সময়ে ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এক একটা আমাদের পৃথিবীর খুব নিকটস্থ হয়, তখন জ্যোতির্ব্বিদেরা অনুমান করেন, এইবার বুঝি আমাদের প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পৃথিবীর সঙ্গে একবার একটা এইরূপ জ্বলন্ত পিণ্ডের সংঘর্ষণ হইলে পৃথিবীর যে কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হয়ত এই পৃথিবী একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অণুকণায় পরিণত হইবে। কিম্বা উত্তাপে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া এক উত্তপ্ত বাষ্পগোলক গঠিত হইবে। এইরূপ একটা আশঙ্কার কথা প্রায়ই শুনিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেও একটা আশ্বাসবাণী পাইয়া থাকি "ন দেবাঃ সৃষ্টিনাশকাঃ"। এইরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট গতি ব্যোমচারী আগন্তুক সম্প্রতি আমাদের পৃথিবীর প্রায় গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই ধূমকেতুটি আবার তীব্র বিষাক্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ। এইরূপ ধূমকেতু ইত্যগ্রে কখনও দেখা যায় নাই। জ্যোতির্ব্বিদেরা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে জাগতিক পরিবারের মধ্যে এমন একটা কুগ্রহ আছে। ইহার নিশ্বাস যদি পৃথিবীর গাত্রে একবার লাগিত তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব জন্তু, এমন কি তরুলতায়াও প্রাণ হারাইত। এই ধূমকেতুটি "সাইনোজেন" নামক একরকম বাষ্পে পরিপূর্ণ—এই বাষ্প এরূপ মারাত্মক যে ইহার কণামাত্র সমস্ত জীব-জগৎকে ধ্বংস করিতে পারে। করুণাময় পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় মহিমায় এই গ্রহটী এখন পৃথিবী হইতে বহুলক্ষ যোজন দূরে অন্তর্হিত হইয়াছে, এজন্য এখন আর আমাদের বিশেষ চিন্তার কারণ নাই।

সেপ্টেম্বরের প্রথমে যুক্ত-আমেরিকা ও মার্সেলিসের দুইজন জ্যোতির্ব্বিৎ দুই বিভিন্ন মানমন্দির হইতে প্রায় একই সময়ে এই ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। প্রথমে দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইহা একটি অস্পষ্ট ক্ষুদ্র বাষ্পপিণ্ডবৎ দেখা যায়। একমাসের মধ্যে ইহা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল এবং সহজ চক্ষুতেই দেখা গেল। ইহার অনেকগুলি আলোক-চিত্র লওয়া হইয়াছে। ইহাতে অনেক তথ্য সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রথম চিত্র লইবার সময়ই ইহার পুচ্ছ আছে দেখা যায়—তৎপরে দেখা যায় সম্মার্জ্জনীর ন্যায় পুচ্ছ বহুঅংশে বিভক্ত এবং তথা হইতে আলোকশিখা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। ধূমকেতুর পুচ্ছগুলি সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে, ইহা অনেক দিন হইতে জানা আছে। সূর্য্যরশ্মি সমূহ ধূমকেতু গুলির উপর পড়িয়া যেন জোর করিয়া উহাদিগের শিখাগুলিকে বিপরীত দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। এই তথ্যটী উল্লিখিত ধূমকেতুতে সুস্পষ্টভাবে জানা গিয়াছে। ইহার পুচ্ছ বিস্তারিত হইয়া কোটী ক্রোশেরও অধিক চলিয়া গিয়াছে। আলোক বিশ্লেষণ (Spectroscope) যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে অন্যান্য ধূমকেতুর ন্যায় ইহা "হাইড্রোকারবন" বাষ্পে গঠিত নহে। ইহার প্রধান উপাদান "সাইনোজেন" বাষ্প; এই বাষ্প "আজোট" ও "কার্ব্বন" মিশ্রনে উৎপন্ন হয় এবং ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। ইহার এই বাষ্পময় পুচ্ছের কিয়দংশ মহীমণ্ডলস্থ বায়ুরাশির সহিত মিশ্রিত হইলে সকল প্রাণীকুল জীবন হারাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি আন্দোলন চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইত। এখন ধূমকেতুটি কোটী কোটী ক্রোশ দূরে গিয়াছে, আমরাও সুস্থমনে ইহার আলোচনা করিতেছি।

অচল নক্ষত্র।—আকাশে যে অচল নক্ষত্রগুলি দেখা যায়, উহাদের আকৃতি সুবৃহৎ। দূরবীক্ষণদ্বারাও লক্ষ্য করা যায় না। কেবল একটি একটি আলোক বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হয়। উহাদের উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে সহজ চক্ষু কোনটিকে অতিক্ষুদ্র ও কোনটিকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেখে। আলোক বিন্দুর উজ্জ্বলতার তারতম্য আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে কিরূপে নিয়মিত করে, তাহা বুঝিতে হইলে "দর্শন ক্রিয়া" কি রকমে সম্পন্ন হয় সেটা জানিতে হইবে। অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্বর্ত্তী ঝিল্লী বিশেষকে অক্ষিপট বলে। বাহ্যবস্তুর প্রতিকৃতি উহাতে প্রতিবিম্বিত হইলে, উহা চাক্ষুষ-শিরাদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। তখন আমাদের দর্শনজ্ঞান জন্মে। এই অক্ষিপটে অনেকগুলি স্তর আছে। ইহার মধ্যে একটি স্তর সমবর্ত্তুল ও মোচাকার কোষসমূহে গঠিত। আলোক বিন্দু অক্ষিপটের অন্তর্গত ঐ স্তরের উপরে যে পরিমানে আলোক বিকীরণ করে উহাও সেই অনুপাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ দেখায়। এবং এই জন্য অচল নক্ষত্রগুলিও ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতীত হয়।

লৌহ-সংস্কার।—বিশুদ্ধ লৌহ আকর হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহার সহিত অনেক প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। ক্রমে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও লৌহকে একেবারে নির্ম্মল করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি জর্ম্মনদেশীয় রসায়ণতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ক্রোজলার (Dr.Krausler) বহুবিধ রাসয়ানিক ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া দ্বারা অতি সুকৌশলে উহা সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন সাধারণ লৌহের সহিত এই নির্ম্মল লৌহ অনেকাংশেই মিলে না। ইহার সহিত প্লাটিনাম ধাতুর সাদৃশ্য আছে।

শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

Science Jotting—"Empire"

বিলাতে মাঘোৎসব।—লণ্ডন নগরে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের উৎসাহে ও চেষ্টায় Essex Hall এ মাঘোৎসব হইয়াছিল। রেঃ চার্লস ভয়েসী সাহেব একদিন বক্তৃতা দেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন "Beware of any form of christianity" খৃষ্টীয় ভাব হইতে ব্রাহ্মগণকে সাবধান থাকিতে হইবে। Harrison সাহেব ও Rev. John Page Hopps সাহেবও বক্তৃতা দান করেন।

অনুবাদ।—মহর্ষির আত্মজীবনী বাঙ্গালা হইতে উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু উহার ইংরাজি অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন আশা আছে।

বিবাহে বিচ্ছেদ।—The christian Life পরিতাপের সহিত ২৩এ জানুয়ারি তারিখের পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে বিবাহে বিচ্ছেদের (divorce) আধিক্য দেশের দুর্গতি সূচনা করে। United Estates ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইহার সংখ্যা নিতান্ত অধিক; দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে হ্রাস হইবার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে না। এমন কি প্রত্যেক বারটি বিবাহের মধ্যে একটি বিচ্ছেদে পরিণত হয়।

অপরাধ।—বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স দেশে যদিও লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হয় নাই কিন্তু, অপরাধ সংখ্যা তিন গুণ বিবর্দ্ধিত হইয়াছে!

সংযম।—রেখাক্ষরের (short-hand) সৃষ্টিকর্ত্তা পিটমানের (Sir Isaac Pitman) জীবনী বাহির হইয়াছে। ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ভয়ানক পরিশ্রমী ছিলেন। পিটমান সাহেব বলেন ত্রিশ বৎসর বয়সে আমি অজীর্ণ রোগে মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। ডাক্তারেরা দিনের ভিতরে তিনবার মদ্য ও মাংস ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ফলে রোগ আরও ভীষণ আকার ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া আমি মদ্য মাংস একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। ক্রমে আমার পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাইল। ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা লেখাপড়ার কার্য্য করিয়াছি; এবং সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে মদ্য মাংস ত্যাগ ও ধূমপান বিরতি আমার স্বাস্থ্য ও পরিশ্রম শক্তির নিদান। Lord Mayor লর্ডমেয়র ৭৪ বৎসর বয়সে একবার তাঁহাকে Mansion Houseএ নিমন্ত্রণ করেন এবং সেখানে পিটমান সাহেবের আহার পানের জন্য কেবলমাত্র আলু ও এক গ্লাস জল ছিল।

উৎসব।—বিগত ২৩৷ফাল্গুন তারিখে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব বিশেষ অনুরাগের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন মহাশয়ের এক মাত্র উদ্যম ও যত্নে এখানকার ব্রাহ্মসমাজ বহুকাল হইতে নানা-বিধ বিপদ ও বিনাশের মধ্য দিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আসিতেছে। বিনোদ বাবু স্বয়ং আসিয়া উৎসবের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ও সুগায়ক শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেনকে লইয়া যান। তাঁহারা পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যার সময়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া পরলোক গত সম্পাদক যোগেশচন্দ্র সরকারের বাটীতে উপাসনা করেন। প্রত্যেক বৎসর ঐ দিবসে এই বাটীতে পারিবারিক উপাসনা হইয়া থাকে। পর দিবস সমাজ গৃহে প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা ও উপদেশাদি হইয়াছিল। উৎসবে পরিমিত সংখ্যক লোকের সমাগম হইলেও তাঁহারা শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে ঔপনিষদ ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ শুনিয়া বিশেষ সুখী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ স্থাপন করিয়াছেন। পর দিবস প্রাতে বিনোদ বাবুর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা ও উপদেশ হয়। বন্ধু বান্ধব ও পারিবারিক স্ত্রীগণ গৃহ কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া মধুময় প্রভাতে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ রসের যে কি এক অনুপম মহিমা এই সময়ে তাহার এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছিল। জনৈক সুপণ্ডিত কবিরাজের সহিত কোন ব্রাহ্ম পরিবারের বাটীর সীমা লইয়া বিবাদ চলিতেছিল এবং তাঁহারা উভয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু উপাসনার অব্যবহিত পরেই শাস্ত্রী মহাশয় যখন সেই বাদী ও বিবাদী উভয় ব্যক্তিকেই ঈশ্বরের মঙ্গল ও শান্তিভাব স্মরণ করিয়া সদ্ভাবে ও কুশলে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখনই তাহা সুফল প্রসব করিল! তাঁহারা অনুতপ্ত চিত্তে বিবাদ মিটাইয়া সদ্ভাবে বাস করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর সন্ধ্যার সময়ে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গনে ব্রহ্মোপাসনা ও উপদেশ হয়। চিকের অন্তরালে মহিলাগণ ও বাহিরে অনেকগুলি সুশিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ ভদ্রলোক সমাসীন হইয়াছিলেন। উপাসনা উপদেশ ও সঙ্গীতের মধুর ভাবে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল।

যে যে পরিবারে উপাসনা হইয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই হিন্দু-সমাজ ভুক্ত। কিন্তু হিন্দু বলিয়া ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মের প্রতি কাহারও ঘৃণা বা অরুচি দূরে থাকুক বরং তদ্বিপরীত শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বিশেষ পরিচয় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়াছে। মার্জ্জিত হিন্দু আচারের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান পতিত হইলে হেমন্ত প্রভাতে তৃণোপরি শিশির-বিন্দুর ন্যায় শোভা ধারণ করে।

শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৬ চৈত্র শ্রীরামপুর প্রবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রীর আদ্য-শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। কলিকাতা দক্ষিণেশ্বর এবং শ্রীরামপুরের অনেকগুলি ভদ্র বন্ধু আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। তারিণী বাবু ও তাঁহার পুত্রেরা এই ধার্ম্মিকা সতীর ইচ্ছানুসারে আদি-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রাদ্ধের গুরুত্ব রক্ষা করিয়াছেন। গঙ্গা বক্ষে দ্বিতল প্রকোষ্ঠে শ্রাদ্ধের বেদ মন্ত্র সকল উচ্চারিত হইতেছে। নিম্নে বিশাল গঙ্গাস্রোত ও প্রার্থনা কালীন মাতৃভক্ত সুশীল পুত্রগণের অশ্রুধারা একত্র মিশিয়া সেই পরলোকগত জননীর আত্মাকে সিক্ত করিতেছে। এই দৃশ্যে শ্রাদ্ধ স্থল অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছিল। আমরা প্রার্থনা করি এই পরলোক গতা সতীর আত্মাকে পরম-পিতা পরমেশ্বর শাশ্বত আনন্দে অভিষিক্ত রাখুন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, আশ্বিন হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২২৮৮৸৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩২৫২৸০
সমষ্টি	...	৫৫৪১৷৶৬
ব্যয়	...	২২৫৭৻৬
স্থিত	...	৩২৮৪৷৶০

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবদ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৬৮৪৷৶০

৩২৮৪৷৶

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ...	...	১১০৬৷৩

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান
১০০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায়	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	১০৲
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দত্ত	১৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত	২৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু	২৲
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
শ্রীযুক্ত হরকুমার সরকার	১৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৷৩
ইলেকট্রিক লাইটের হাওলাত আদায়	৭৫৲
	১১০৬৷৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৭৮৲
পুস্তকালয়	...	৫৯৷০
যন্ত্রালয়	...	৪৭৯৸৶৩
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১০৭৷০
ইলেক্‌ট্রিক লাইট	...	৪৫৮৲
সমষ্টি	...	২২৮৮৸৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১০৮৪৸৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫৮৷ ৬
পুস্তকালয়	...	২০৷৶৬
যন্ত্রালয়	...	৫২৪৶৯
ব্রাঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন		১৬৷৶৬
ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট		৪৫২৴৯
সমষ্টি	...	২২৫৭৻৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।
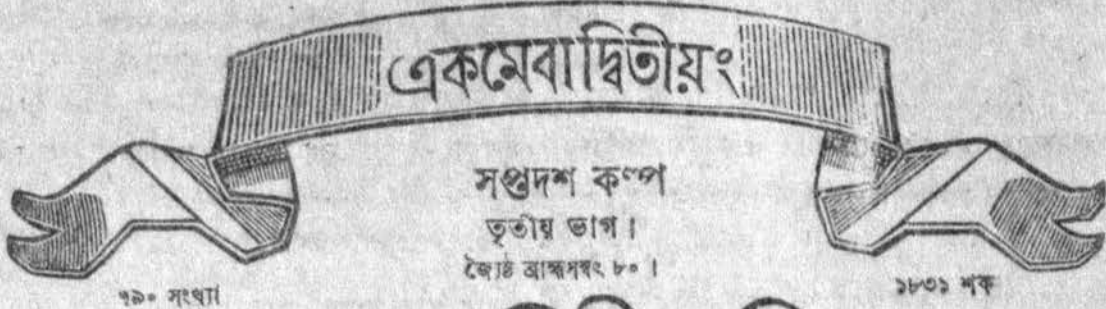
সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৯০ সংখ্যা ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

নববর্ষ।

যে গৃহ ভাঙ্গিয়া তুমি দিয়াছ আমার
জীবনের বিনিময়ে কভু কি আবার
ফিরায়ে পাইব, নববর্ষের মতন ?
চাহিনা নূতন কিছু, সব পুরাতন
দেও দেব, সেই হাসি চির সমুজ্জ্বল,
সেই প্রেম জাহ্নবীর সঙ্গম কল্লোল
অনন্ত প্রবাহে, স্নিগ্ধ পরশ হিল্লোলে
কত যুগ যুগান্তের হৃদি উৎসজলে
ভরিয়া সঞ্চিত সুখ, প্লাবন উচ্ছ্বাসে
ছয় ঋতু সঙ্গ-রিয়া বরষে বরষে,
তোমার মহিমা প্রাণে দিত জাগাইয়া
মূর্ত্তিমান করি তোমা, পূজিবারে হিয়া ;
পরিপূর্ণ জীবনের সে দিন হেলায়
কাড়িয়া লয়েছ, আজি নাহিক হেথায়
অতীতের সুখ চিহ্ন ; শুধু স্মৃতি তার
বহিয়া এমন করি কতদিন আর
রহিব তোমার বিশ্বে তোমারে ভুলিয়া,
আপনার শোক দুঃখে এমনি ডুবিয়া ?
অসীম করুণা তব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
জীবে শান্তি প্রদানিছে বরষ আনিয়া,
সেই নব বর্ষ আজ, শান্তির ভিখারী
আসিয়াছি তব কাছে শোকতাপহারী।

১লা বৈশাখ ১৩১৬। শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

নববর্ষ।

সুমঙ্গল সুপ্রভাত জাগে আজি প্রাণে,—
সেজেছে প্রকৃতি-সতী নব পরিধানে ;
প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি সৌরভ বিলায় আজি
চারিদিকে নবভাব নবীন বাসনা ;
হৃদয়ে বিকশি উঠে তব আরাধনা।
নীলাম্বরে নীলমেঘ চন্দ্রাতপ সম
দিতেছে কোমল আভা স্নিগ্ধ অনুপম ;
হাসে আজি ধরাতল, হাসিতেছে অন্তস্তল,
আসিবেন পিতা আজি আমাদের ঘরে
দিতে তাঁর পদ ধূলি বৎসরের পরে।
নব বল নবোৎসাহ কর সবে দান।
তব প্রেমে পূর্ণ কর আমাদের প্রাণ।
করি' মোরা জোড়হাত করিতেছি প্রণিপাত,
তোমারে ছাড়িয়া চলে' নাহি কভু যাই—
অধর্ম্মের পথে যেন সদা ব্যথা পাই।
সবার মাঝারে দাও ধৈর্য্য বীর্য্য ক্ষমা,—
সুকোমল স্নেহ দাও, হৃদয়ে সুষমা ;
সন্তোষ আনন্দ দেহ প্রাণনাথ প্রাণে রহ,
সুখ দুখ সমভাবে হৃদে যেন সহি ;
সবার মাঝারে যেন তব নাম লই।
এ নব বরষে সখা এই সুলগনে
করহ সফলকাম তোমার মিলনে ;
পরশিয়া ও চরণ লভি তব আলিঙ্গন
পুলকিত কর মন অনন্ত সে প্রেমে ;
ফুটিয়া উঠুক দেব স্বর্গ ধরাধামে।

শ্রীলীলা দেবী।

মার্কস অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

প্রাতঃকালে যখন শয্যাত্যাগ করিতে অনিচ্ছা হইবে, তখন এই কথাগুলি আপনার নিকট বলিবে ঃ—মানুষের কাজ করিবার জন্য আমি এখন গাত্রোত্থান করিতেছি, কিন্তু যে কার্য্যসাধনের জন্য আমি সৃষ্ট হইয়াছি, যাহার জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি, সে কার্য্য সাধন করিতে আমার মন যাইতেছে না। তবে কি শুধু ঝিমাইবার জন্য, নেপের ভিতর গরম থাকিবার জন্য আমি সৃষ্ট হইয়াছি? তা হোক্! কিন্তু ইহাতে বেশ আরামে থাকা যায়। মানিলাম। কিন্তু তুমি কি শুধু সুখভোগ করিবার জন্যই জন্মিয়াছ? তোমার কি কোন কাজ করিবার নাই? কার্য্যই কি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে? গাছপালা, পক্ষী, পিপীলিকা, মাকড়সা, মৌমাছি, ইহাদের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ দিকি—দেখিবে, তাহারা সকলেই আপনার স্বভাবানুযায়ী নিজ নিজ কাজ করিতেছে। তবে শুধু কি মানুষই মানুষের মত কাজ করিবে না? তোমার বৃত্তিসমূহকে জাগাইয়া তুমি কি তোমার স্বভাব অনুসারে কাজ করিবার জন্য ধাবমান হইবে না? তাহা হইলেও, বিশ্রাম না করিয়া বাঁচা যায় না। সত্য, কিন্তু প্রকৃতি পানাহারের জন্য একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এ বিষয়ে ত তুমি প্রায়ই সীমা অতিক্রম কর; যাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট, তাহা ছাড়াইয়া যাও। কিন্তু শুধু কাজ করিবার সময়েই, যাহা তোমার সাধ্যায়ত্ত, তাহা অপেক্ষাও কম করিবার দিকে তোমার প্রবণতা দেখা যায়। আসলে, আপনার প্রতি তোমার অনুরাগ নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে তুমি তোমার মানব-স্বভাবকে ভালবাসিতে এবং সেই মানব-স্বভাবের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে। দেখ না কেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় ভালবাসে, তখন সে তাহার কাজ যাহাতে সর্ব্বাংশে সুন্দর হয়, তার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। একজন ছুতোর, ছুতোরের কাজকে,—একজন নৃত্যের শিক্ষক নৃত্যকলাকে যেরূপ সম্মান দেয়, তুমি তোমার মনুষ্যধর্ম্মকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান দেও। কিন্তু ধন ঐশ্বর্য্যের জন্য, খ্যাতিলাভের জন্য, গর্ব্বস্ফীত ও ধনলুব্ধ ব্যক্তিদিগের কতই না আগ্রহ দেখা যায়। এই সকল লোক যখন একটা কিছু পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে। তুমি কি মনে কর, এই সকল তুচ্ছ আমোদপ্রমোদ অপেক্ষা তাহাদের সামাজিক কর্ত্তব্য সকল কম মূল্যবান?

যতক্ষণ না আমার চলৎশক্তি রহিত হয় ততক্ষণ আমি প্রকৃতির পথে—ধর্ম্মের পথে চলিব, তাহার পর আমি বিশ্রাম করিব; যে বায়ু হইতে আমার দৈনিক নিঃশ্বাস পাইয়াছি,সেই বায়ুর মধ্যে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব; যে ধরণী আমার পিতৃপুরুষদিগকে পোষণ করিয়াছেন,আমার ধাত্রীকে দুগ্ধ যোগাইয়াছেন এবং এতদিন আমার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করিয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহের অপব্যবহার করিলেও যিনি সমস্ত সহ্য করিয়াছেন, অন্তিমে সেই ধরণীর ক্রোড়েই শয়ন করিব।

উপকার করিয়া কেহ কেহ প্রতিদান স্বরূপ তোমার নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা চাহিয়া থাকে; কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা বিনীত; তাহারা তোমার যে উপকার করে,

তাহা মনে করিয়া রাখে, এবং তুমি যে তাহার নিকট ঋণী কতকটা সেই ভাবে তোমাকে দেখে। আর এক প্রকৃতির লোক আছে, তাহারা উপকার করে অথচ জানে না তাহারা উপকার করিতেছে। উহারা কতকটা দ্রাক্ষালতার মত; দ্রাক্ষালতা ফল ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট; গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর ধারণ করে অথচ তাহার জন্য ধন্যবাদ প্রত্যাশা করে না। একটা শীকারী কুকুর যখন ভাল করিয়া তাহার কাজ করে কিংবা যখন কোন মৌমাছি একটু মধু সঞ্চয় করে তখন তাহারা কোন সোর-সরাবৎ করে না। যাহারা উপকার করিয়া সে কথা কিছু মনে করে না, তাহাদিগেরই আচরণ আমাদের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক কোন রোগীর জন্য অশ্বারোহণের ব্যবস্থা করেন, কোন রোগীকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে উপদেশ দেন। বিশ্বপ্রকৃতিও কতকটা এই উদ্দেশেই কাহারও জন্য পীড়া, কাহারও জন্য অঙ্গনাশ, সম্পত্তি নাশ, এবং এইরূপ অন্যান্য বিপদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যেরূপ প্রথম স্থলে "ব্যবস্থার" অর্থ রোগীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ, সেইরূপ শেষোক্ত স্থলে "ব্যবস্থার" অর্থ, প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি ও অদৃষ্টের উপযোগী বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ। দেয়ালে পাথরগুলা ভাল করিয়া যোড়া দেওয়া হইলে কারিগররা বলিয়া থাকে, পাথরগুলা বেশ খাপে খাপে বসিয়াছে; আমাদের জীবনের কঠোর ঘটনাগুলিকে এইরূপ ভাবে দেখা উচিত। যেমন এই জগৎ বিশ্বপ্রকৃতির উপাদানেই গঠিত, বিশ্বপ্রকৃতি হইতেই এই জগৎ স্বকীয় রূপ ও সমগ্রতা লাভ করিয়াছে, সেইরূপ ইহার মধ্যে যে কার্য্যকারণ-পরম্পরা রহিয়াছে তাহারই যোগাযোগে অদৃষ্টের বিশেষ ফলাফল প্রসূত হয়। সাধারণ লোকে এ কথা বেশ বোঝে। তাহাদের বলিবার ধরণটা এই :—"অমুকের এইরূপ ঘটিয়াছে, কেন না, ইহা তাহার অদৃষ্টে ছিল।" চিকিৎসকের ব্যবস্থা-পত্র অনুসারে যেমন আমরা চলিয়া থাকি, সেইরূপ আমাদের ললাটলিখনের কথাও যেন আমরা অকাতরে পালন করি। অরুচিকর ও তিক্ত হইলেও, স্বাস্থ্যের খাতিরে ঔষধ যেমন আমরা হৃষ্টচিত্তে গলাধঃকরণ করি; সেইরূপ, প্রকৃতি যাহাকে হিতজনক ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন, তাহাকে তোমার নিজের স্বাস্থ্যের মত মনে করিবে। অতএব যখন কোন বিপর্য্যয় ঘটিবে, তখন তাহা শান্ত ভাবে গ্রহণ করিবে। ইহা বিশ্বজগতের স্বাস্থ্যের উদ্দেশেই ঘটিয়া থাকে। ইহা নিশ্চিত জানিও, যদি জগতের হিত না হইত, তাহা হইলে কখনই এই দুর্ঘটনা তোমার নিকট প্রেরিত হইত না। আর প্রকৃতি কখনই খামখেয়ালি ভাবে কাজ করেন না, তিনি এমন কোন কাজ করেন না, যাহা তাঁহার শাসনাধীন জীবসমূহের অনুপযোগী। অতএব, দুই কারণে তোমার নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে :—প্রথমত,—অতীব উচ্চ ও অতীব পুরাতন কারণসমূহ হইতে তুমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং ইহা গোড়া হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র জগতের সাধারণ হিতের জন্য ব্যক্তিবিশেষের অদৃষ্ট নির্দ্ধারিত হয়। সমগ্র হইতে কিয়দংশ ছাঁটিয়া ফেলিলে সমগ্রকে বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলা হয়, সমগ্রের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়। অতএব, তুমি যদি আপনার অবস্থায় অসন্তুষ্ট হও,—তাহার অর্থ এই তুমি বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গহানি করিতে চাহ, তোমার

যতটা সাধ্য, জগৎকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিতে চাহ।

বস্তু ও রূপ লইয়া—অর্থাৎ শরীর ও আত্মা লইয়াই আমার সত্তা; ইহার কোনটাই ধ্বংস হইবার নহে; কেন না, উহারা 'নাস্তি' কিংবা 'কিছু না' হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং আমার সত্তার প্রত্যেক অংশ জগতের কোন-না-কোন কাজে লাগিবে, এবং এই অংশ আবার অপর অংশে পরিবর্ত্তিত হইবে—এবং এই পরিবর্ত্তন-পরম্পরা অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। এই চিরপরিবর্ত্তনের পদ্ধতি হইতেই আমার সত্তা উৎপন্ন হইয়াছে,—আমার পূর্ব্বে, আমার পিতার সত্তাও এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ অনাদি অতীত কাল হইতেই এই প্রবাহ চলিতেছে।

প্রজ্ঞা ও যুক্তি আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত—অপরের সাহায্য উহাদের প্রয়োজন হয় না। উহারা আপনার মধ্যেই বিচরণ করে এবং অব্যবহিতরূপে কার্য্য করে; প্রজ্ঞা ও যুক্তি অনুসারে আমরা যে কাজ করি তাহাই ঠিক্ কাজ, উহা ঠিক্ পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া যায়।

মানুষের হিসাবে যে সমস্ত জিনিস মানুষের তাহাই মানুষের নিজস্ব, তাহা ছাড়া মানুষের নিজস্ব কিছুই নহে। কেন না, মনুষ্যত্বের ভাবের মধ্যে ঐ সমস্ত জিনিসের সমাবেশ নাই, সুতরাং মানুষের হিসাবে সে সমস্ত জিনিসে আমাদের প্রয়োজন নাই; আমাদের মনুষ্যত্ব সেই সকল জিনিস দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে না, এবং সেই সকল জিনিসে আমাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণতাও সম্পাদিত হয় না। সুতরাং সেই সমস্ত মানুষের প্রধান লক্ষ্য নহে। যদি এই সমস্ত বাস্তবিকই আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হইত, তাহা হইলে ঐ সকলের জন্য কেন আমাদের অবজ্ঞা উপস্থিত হয়, এবং সেই সমস্ত ছাড়িয়া সুখী হইতে পারিলে কেন উহা এত প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে? যদি বাস্তবিকই ঐ সকল জিনিস আমাদের পক্ষে ভাল হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়া কি নিতান্ত বাতুলতার কাজ নহে? কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। কেন না, আমরা ইহা বেশ জানি,—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আত্মত্যাগ ও ঔদাসীন্য, এবং ঐ সকল বিষয় আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলে যে ধৈর্য্য আবশ্যক সেই ধৈর্য্যই সাধু ব্যক্তির লক্ষণ।

মনুর উপদেশ।

মোক্ষসাধন কর্ম্ম।

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্॥

বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা—এই সমস্ত পরম নিঃশ্রেয়স্কর কর্ম্ম অর্থাৎ মোক্ষের উৎকৃষ্ট সাধন।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং শুভানামিহ কর্ম্মণাম্
কিঞ্চিচ্ছ্রেয়স্করতরং কর্ম্মোক্তং পুরুষং প্রতি॥

এই সকল শুভ কর্ম্মের মধ্যে পুরুষের পক্ষে কোন্ কর্ম্ম কিঞ্চিৎ অধিকতর শ্রেয়স্কর?

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাম্ প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; উহা সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান; উহা হইতেই অমৃত লাভ হয়।

যগ্নামেষাস্তু সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং প্রেত্য চেহ চ
শ্রেয়স্করতরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বদা কর্ম্ম বৈদিকম্॥

কি ইহকালে কি পরকালে, উপরোক্ত

ছয়টি মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে, বৈদিক কর্ম্মই সর্ব্বদা শ্রেয়স্কর জানিবে।

বৈদিকে কর্ম্মযোগে তু সর্ব্বাণ্যেতান্যশেষতঃ
অন্তর্ভবন্তি ক্রমশস্তস্মিং স্তস্মিন্ ক্রিয়াবিধৌ॥

পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কর্ম্মই ক্রমশঃ বৈদিক কর্ম্মযোগে সেই সেই ক্রিয়াবিধির অন্তর্ভূত হইয়া থাকে।

সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥

বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্ত কর্ম্ম ও নিবৃত্ত কর্ম্ম; প্রবৃত্ত কর্ম্মফলে সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্ম্মফলে মুক্তিলাভ হয়।

ইহ চামুত্র বা কামং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্ত নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥

ইহলোক-সম্বন্ধে অথবা পরলোক সম্বন্ধে, কোন কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত-কর্ম্ম বলে; কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক নিষ্কাম যে কর্ম্ম তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে।

প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্
নিবৃত্তং সেবমানস্ত ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥

প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান হওয়া যায়, আর নিবৃত্ত কর্ম্মের অভ্যাসে পঞ্চভূতকেও অতিক্রম করা যায়।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

আত্মযাজী, আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে সমভাবে দেখিয়া স্বারাজ্য লাভ করে (ইহাই অধ্যাত্মিক "স্বরাজ")।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যথোক্ত সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞান, শম (ইন্দ্রিয়জয়) প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেন।

এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥

এই সকলই দ্বিজাতির-বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্মসাফল্যের মূলীভূত; ইহা লাভ করিয়াই দ্বিজ কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, ইহার অন্যথা নাই।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে ফোটোগ্রাফি।

যন্ত্রব্যবহার আজকাল অনেক দুঃসাধ্য কাজকে অনায়াসসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। কৃষিশিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে এখন যন্ত্রই প্রধান অবলম্বন। বিজ্ঞানও যন্ত্রের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ এবং স্পেক্ট্রোস্কোপ্ (Spectroscope) প্রভৃতি যন্ত্রগুলি যে কত বৈজ্ঞানিক প্রহেলিকার মীমাংসা করিয়াছে সত্যই তাহার ইয়ত্তা হয় না। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে হার্শেল সাহেব যখন তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে ইউরেনাস্ গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন জ্যোতিঃশাস্ত্রের ন্যায় একটা গণিতপ্রধান বিদ্যায় যন্ত্রব্যবহারের উপযোগিতা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন আর সে বিস্ময়ের কারণ নাই। ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ লেভেরিয়ার (Le Verier) এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আডাম্‌স্ সাহেব যে দিন কেবল গণিতের সাহায্যে নেপ্‌চুন্ গ্রহের আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবল গাণিতিক হিসাবে আর কোন জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার হয় নাই। আবিষ্কর্ত্তারা এখন যন্ত্রকেই গবেষণার প্রধান অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছেন।

নানা জ্যোতিষিক যন্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্ মহলে আজকাল ফোটো-

গ্রাফের ক্যামেরার বড়ই আদর। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির সাহায্যে গত ষাট বৎসরের মধ্যে যে সকল জ্যোতিষিক আবিষ্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাদেরি একটি স্থূল বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে ফোটোগ্রাফের যন্ত্র কেবল ছবি তোলার জন্যই ব্যবহৃত হইত; ইহা যে কোন কালে বৈজ্ঞানিকদিগের হস্তে পড়িয়া চক্ষুর অগোচর নানা জ্যোতিষ্কের পরিচয় সংগ্রহ করিতে থাকিবে, তাহা সেই সময়ে কেহ কল্পনাই করিতে পারেন নাই।

মানবচক্ষুর গঠনপ্রণালী খুব সুন্দর হইলেও বিধাতা ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দেন নাই। অতিদূর জ্যোতিষ্কের ক্ষীণ আলোকে মানবচক্ষু সাড়া দেয় না। কিন্তু রাসায়নিক প্রলেপ-যুক্ত ফোটোগ্রাফের কাচের উপর সেই ক্ষীণালোকই দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িতে থাকিলে কাচে ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কটির ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে। বহুক্ষণ কোন অস্পষ্ট জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে মানবচক্ষু অবসন্ন হইয়া আসে। তখন আর সেই জিনিসটিকে দেখা যায় না। ফোটোগ্রাফের কাচের অবসাদ নাই। রাত্রির পর রাত্রি একই অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দিকে উন্মুক্ত রাখ, তাহার খুঁটিনাটি সকল বিবরণ কাচের উপরকার চিত্রে ফুটিয়া উঠিবে। আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, আকাশপর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের এই সকল উপযোগিতা বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং কিছুদিন পরেই ইঁহারা এই যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্কের চিত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল চিত্রদৃষ্টে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কত ধূমকেতু নিহারিকা এবং ক্ষুদ্রগ্রহ (Asteroids) আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

গত ১৮৬০সালে স্পেন্ অঞ্চলে যে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তাহারি পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বপ্রথম ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল। পূর্ণগ্রহণের সময়ে যখন সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রদ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে তখন চন্দ্রের ঘোর কৃষ্ণবিম্বের চারিদিক হইতে রক্তশিখাকারে একপ্রকার আলোক বাহির হইতে আরম্ভ করে। এগুলি চন্দ্রমণ্ডল হইতে বহির্গত হয় বলিয়া পূর্ব্ববৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেন, কিন্তু এই অনুমানের পোষক কোন প্রমাণই তাঁহারা দেখাইতে পারিতেন না। স্পেনের সূর্য্যগ্রহণের ছবি উঠাইয়া বিষয়টির মীমাংসা করিবার জন্য দুই জন জ্যোতিষী নানা আয়োজন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে ছবি উঠাইয়া পরীক্ষা করায় দেখা গিয়াছিল, নগ্নচক্ষুতে দৃষ্ট শিখাগুলি ব্যতীত আরো কতকগুলি ক্ষীণ শিখার সুস্পষ্ট ছবি চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার দৃষ্টিশক্তি মানবদৃষ্টিশক্তির তুলনায় যে কত প্রখর, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, এবং কেবল পূর্ব্বোক্ত ছবিগুলি পরীক্ষা করিয়া, রক্তশিখাগুলি যে সূর্য্য হইতেই নির্গত হয় তাহাও বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক গ্রহণেরই শত শত ছবি উঠানো হইয়াছে। এই সকল চিত্র পরীক্ষা করিয়া সূর্য্যের আকাশমণ্ডল ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থাসম্বন্ধে যে সকল নব নব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অন্য উপায়ে আবিষ্কার করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

সৌরতত্ত্বাবিষ্কারে ফোটোগ্রাফির যতটা

সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, গ্রহতত্ত্ব নিরূপণে ইহা ততটা সাহায্য করে নাই। ফোটোগ্রাফের ছবিতে নিকটস্থ গ্রহজাতীয় জ্যোতিষ্কের উপরকার দ্রষ্টব্যগুলি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে না। এইজন্য ভাল দূরবীন্ দ্বারা গ্রহবিম্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাধারণ নিয়মে তাহাদের ছবি অঙ্কন করিবার রীতি আজও প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে ফোটোগ্রাফির যে প্রকার উন্নতি হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় গ্রহগণেরও নিখুঁৎ ফোটো উঠাইবার উপায় শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে।

যে দিন জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল, জ্যোতির্ব্বিদ্গণ সেই দিনই বুঝিয়াছিলেন নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণে ইহা তাঁহাদের একটি প্রধান সহায় হইবে। এখন তাঁহাদের সেই অনুমান সম্পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জ্যোতিষীদিগের নিকট ভাল নাক্ষত্রিক মানচিত্র ছিল না। নগ্নচক্ষুতে আকাশে প্রায় ছয় হাজার নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলির অবস্থান স্থির করিয়া তাহা যথাযথ ভাবে মানচিত্রে নির্দ্দেশ করা সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই হস্তাঙ্কিত মানচিত্রে অনেক ভুল থাকিয়া যাইত। ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আকাশের মানচিত্রাঙ্কন এখন অতি সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্সের দুইজন জ্যোতিষী নক্ষত্রখচিত সমগ্র আকাশের মানচিত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নানা দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্গণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। কার্য্য শেষ হইলে মানচিত্রটি নিশ্চয়ই এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে।

এতদ্ব্যতীত পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের (Variable Stars) আবিষ্কারে ফোটোগ্রাফির অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর নক্ষত্রগুলির জ্যোতিঃ সকল সময় সমান থাকে না। এক একটি নির্দ্দিষ্ট কালের শেষে ইহাদের উজ্জ্বলতা স্পষ্ট কমিয়া আসে। জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির প্রচলন হইবার পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ কেবল কয়েকটি মাত্র পরিবর্ত্তনশীল তারকার সহিত পরিচিত ছিলেন। এখন একই নক্ষত্রপুঞ্জের নানা সময়ের ছবি তুলনা করিয়া শত শত নক্ষত্রকে পরিবর্ত্তনশীল দেখা যাইতেছে। আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী পিকারিং সাহেব অল্প দিনের মধ্যে শতাধিক পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন।

নূতন নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব আজকাল একটি অতি সুলভ জ্যোতিষিক ঘটনা বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্গণ কেবলমাত্র দুই একটি নক্ষত্রের আকস্মিক প্রজ্বলন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নক্ষত্রমণ্ডলীর ফোটোগ্রাফের ছবি গ্রহণ করার পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার পর নূতন নক্ষত্র আর জ্যোতিষীদিগের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারিতেছে না। নক্ষত্রপুঞ্জের নানাকালের বহু চিত্র তুলনা করিয়া ইঁহারা অনেকগুলি নূতন নক্ষত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। গত ১৮৯২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রজাপতি (Auriga) রাশিতে হঠাৎ একটি নূতন উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিষিগণ মনে করিয়াছিলেন ঐ দিনেই বুঝি নক্ষত্রটি প্রজ্বলিত হইয়া পড়িয়াছে। ডিসেম্বর মাসে উক্ত রাশির যে ছবি উঠানো হইয়াছিল, অনুসন্ধান করায় তাহাতেও ঐ নক্ষত্রটিকে ক্ষীণাকারে দেখা গিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয় জন্মের দুইমাস পরে,

নূতন জ্যোতিষ্কটি জ্যোতির্বিদ্‌দিগের নিকট ধরা দিয়াছিল। এই ঘটনার পর জ্যোতিষিগণ আকাশের সর্ব্বাংশে খরদৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নূতন নক্ষত্রগুলির লুক্কায়িত থাকিবার এখন আর উপায় নাই।

নানাশ্রেণীর নক্ষত্রগুলির মধ্যে যুগলজাতীয় নক্ষত্রের (Double Stars) গতিবিধি লইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রায়ই আলোচনা করিয়া থাকেন। এই নক্ষত্রগুলি যুগ্মাবস্থায় থাকিয়া এবং কখনো কখনো তিন চারিটি একসঙ্গে থাকিয়া তাহাদের সাধারণ ভারকেন্দ্রের (Centre of gravity) চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কয়েকটিমাত্র যুগলতারকার সন্ধান জানিতেন। ফোটোগ্রাফের ছবি পরীক্ষা করায় এখন যুগলনক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ঐ উপায়ে ইহাদের অনেকগুলির গতির পরিমাণও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সকল যুগলনক্ষত্রের জ্যোতিষ্কদ্বয় অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী থাকে, তাহাদের যুগ্মতা বুঝিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। সাধারণ যুগলনক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা নগ্নচক্ষুতে তাহাকে যেমন একক নক্ষত্রের ন্যায়ই দেখি, বৃহৎ দূরবীন্ দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে পূর্ব্বোক্ত অতিনিকট যুগলগুলিকে সেইপ্রকার একক নক্ষত্র বলিয়াই ভ্রম হয়। ফোটোগ্রাফের ছবিদ্বারা এই শ্রেণীর অনেক নক্ষত্রের যুগ্মতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রশ্মি-নির্ব্বাচনযন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে ইহাদের যে বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) উৎপন্ন হয়, তাহার ছবি উঠাইলে, ফোটোগ্রাফের কাচে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণচ্ছত্র উপর্য্যুপরি অঙ্কিত হইয়া পড়ে। কাজেই নক্ষত্রগুলিকে দূরবীক্ষণে একক দেখাইলেও তাহারা যে বাস্তবিক একক নয়, তাহা বর্ণচ্ছত্রের যুগলছবি দেখিয়া বেশ বুঝা যায়।

নিহারিকাপুঞ্জের (Nebula) সহিত অতিপ্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগেরও পরিচয় ছিল। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতিষিগণ এনড্রোমিডা (Andromeda) ও মৃগশিরা রাশির বৃহৎ নিহারিকা দুটিকে নগ্নচক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ এগুলিকে দূরবীন্ দিয়াও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই ইহাদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এখন এই নিহারিকাদ্বয়ের শত শত ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আকাশের নানা অংশের ছবি তুলিয়া আরো যে কত বিচিত্র আকারের নিহারিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। যে সকল নিহারিকাকে বৃহৎ দূরবীনেও দেখা যায় নাই, ফোটোগ্রাফের কাচে তাহাদের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধূমকেতুর উচ্ছৃঙ্খলতা চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ইহার ন্যায় জ্যোতিষ্ক যে ফোটোগ্রাফের ছবিতে ধরা দিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিবে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহা মনে করিতে পারেন নাই। ১৮৯২ সালে অধ্যাপক বারনার্ড (Barnard) সর্ব্বপ্রথমে ফোটোগ্রাফের ছবি দেখিয়া একটি ধূমকেতুর আবিষ্কার করেন। দূরবীনে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কেবল ছবি দেখিয়াই তাহার আকার প্রকার গতিবিধি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর শত শত ধূমকেতুর ছবি উঠানো হইয়াছে, এবং সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলে ইহাদের পুচ্ছ ও মুণ্ডাদি কিপ্রকার বিচিত্র আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে, একই ধূমকেতুর নানা সময়ের ছবি তুলনা ক-

রিয়া তাহা সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। আগামী শীতের শেষে জগদ্বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতুর (Halley's Comet) উদয় হইবে। এটি প্রায় ৭৬ বৎসরে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ শেষ করিয়া এক একবার পৃথিবীকে দেখা দিয়া যায়। গত ১৮৩৫ সালে ইহার শেষ উদয় হইয়াছিল, সুতরাং আগামী ১৯১০ সালে ইহার প্রদক্ষিণকাল পূর্ণ হইবে। দূরবীক্ষণে এবং নগ্নচক্ষুতে দেখা দিবার অনেক পূর্ব্বে এটি নিশ্চয়ই ফোটোগ্রাফের ছবিতে ধরা দিবে। *

অনন্ত নক্ষত্রলোকের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সৌরজগতের ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর ফোটোগ্রাফি কি কার্য্য করিয়াছে, এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রহতত্ত্বের গবেষণায় ফোটোগ্রাফি বৈজ্ঞানিকদিগকে বিশেষ সাহায্য করে নাই। কিন্তু উপগ্রহতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলে আর সে কথা বলা চলে না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটি নূতন উপগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিরই সন্ধানে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ফোটোগ্রাফির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে যেমন একটিমাত্র চন্দ্র ঘুরিয়া বেড়ায়, দূরবীন্ দিয়া দেখিলে শনিগ্রহের চারিদিকে সেইপ্রকার আটটি চন্দ্রকে ঘুরিতে দেখা যায়। সুতরাং এপর্য্যন্ত শনির উপগ্রহের সংখ্যা আটটি বলিয়াই স্থির ছিল। গত ১৮৯৮ সালে মার্কিন জ্যোতিবিদ্ পিকারিং সাহেব শনির নিকটবর্ত্তী আকাশের ছবিতে হঠাৎ একটি নূতন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ ছবি উঠাইয়া পরীক্ষা করায়, প্রত্যেক চিত্রেই জ্যোতিষ্কটিকে স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল, এবং সেটি যেন ক্রমে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে বলিয়াও বোধ হইয়াছিল। এইপ্রকারে জ্যোতিষ্কটি ধরা দিলে, অধ্যাপক পিকারিং ও বারনার্ড সাহেব তাহাকে শনিরই একটি উপগ্রহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আজ দুই বৎসর হইল ঐ পিকারিং সাহেবই ফোটোগ্রাফ্ পরীক্ষা করিয়া শনির আর একটি উপগ্রহের সন্ধান দিয়াছেন। কেবল ফোটোগ্রাফির সাহায্যে কয়েকবৎসর পূর্ব্বেকার অষ্ট উপগ্রহযুক্ত শনি এখন দশচন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রহরাজ বৃহস্পতিরও চন্দ্র সংখ্যা ফোটোগ্রাফির সাহায্যে সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্যালিলিয়োর সময় হইতে এপর্য্যন্ত এই গ্রহটির চন্দ্রের সংখ্যা চারিটি বলিয়াই স্থির ছিল। গত ১৮৯২ সালে ইহার পঞ্চম গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল। এই ঘটনার পর প্রায় দশবৎসর কালের মধ্যে বৃহস্পতিপরিবারস্থ কোন নূতন জ্যোতিষ্কের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গত ১৯০৪ এবং ১৯০৫ সালে পেরিন্ সাহেব (Perrine) বৃহস্পতিক্ষেত্রের ছবি পরীক্ষা করিতে গিয়া ক্রমে আরো দুইটি উপগ্রহের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন, এবং গতপূর্ব্ব বৎসর ইংরাজ জ্যোতিষী মেলট্ (Melotte) সাহেব গ্রীন্‌উইচ্ মানমন্দির হইতে ছবি উঠাইয়া বৃহস্পতির আর একটি উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে এক ফোটোগ্রাফির দ্বারাই বৃহস্পতির উপগ্রহসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এখন আটটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চক্ষু উন্মিলিত রাখিয়া প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কত তুচ্ছ ব্যাপারের

* আগামী বৎসর যে বৃহৎ ধূমকেতুটির উদয় হইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ইহার ইতিহাস এবং আবিষ্কারবিবরণ বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

ভিতর দিয়া যে জগদীশ্বরের অপার মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকা যায় না। জ্যোতিষ্কলোকের স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা গিয়াছে ভাবিয়া যখন বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন, ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যে কত অল্প তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছিল। জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তির যে এক ক্ষুদ্রকণা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শৃঙ্খলিত করিয়া কঠোর নিয়মবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে কত বিশাল ও দূরব্যাপী ক্ষুদ্রযন্ত্রটি সঙ্গে সঙ্গে সেটিও চাক্ষুষ দেখাইয়াছিল। যে সকল মানুষ জগদীশ্বরের আনন্দময় অসীম শক্তির এই সকল অদ্ভুত লীলা অহরহ দেখিয়াও তাহাদের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা বাস্তবিকই অন্ধ এবং কৃপার পাত্র।

অসীমের সহিত সুর বাঁধা।

মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোচ্চ সত্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক অসীম আত্মা সকলের আদি কারণ, এবং তাঁহা হইতে সকলই আসিতেছে; বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ এই মহাসত্যে আমরা এইক্ষণে উপনীত হইয়াছি। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। এই মহাসত্য জ্ঞানপূর্ব্বক জীবন্তরূপে উপলব্ধি করা এবং অনন্ত প্রস্রবণ হইতে যে প্রবাহ বহমান হইতেছে, সেই দিব্য প্রবাহের পথে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত রাখা, ইহা কি প্রত্যেক মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? অসীম আত্মার সহিত আমাদের ঐকাত্ম্য সম্বন্ধ আমরা যে পরিমাণে জ্ঞানপূর্ব্বক উপলব্ধি করিতে পারি, দিব্য প্রবাহের পথে যে পরিমাণে আমরা জীবনকে উন্মুক্ত রাখিতে সক্ষম হই, ঠিক সেই পরিমাণে আমরা অসীম আত্মার গুণ ও ক্ষমতা সকল লাভ করিতে থাকি।

এরূপ হয় কেন? এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, এই উপায়ে আমরা নিজের সহিত যথার্থরূপে পরিচিত হই, জগতের মহান নিয়ম ও শক্তি সমূহের সহিত নিজের জীবনের সুর বাঁধিতে শিখি এবং জগতের সমস্ত ঋষি মুনি বুদ্ধ আদি যথার্থ মহামহিমান্বিত ব্যক্তিদিগের ন্যায়, আমরাও নিজের অন্তরে দৈববাণী শুনিতে পাইবার যোগ্য হই। আমাদের এই প্রকারে উপলব্ধ শক্তি যতই বাড়িতে থাকে, সেই অসীম মূলাধারের সহিত যোগসাধনে আমরা যতই অগ্রসর হই, আমাদের অন্তরে উচ্চতর শক্তি সকলের লীলাভূমি, কার্য্যক্ষেত্র, আবির্ভাব-পথ ততই প্রশস্ত হইতে থাকে।

আমাদের অজ্ঞানতার বাঁধে দেবশক্তির দিব্যপ্রবাহের গতি রোধ হয়, আমাদের অজ্ঞান অন্ধকারে দেব আবির্ভাব অপ্রকাশ থাকে। অথবা আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের অন্তরের দ্বার রুদ্ধ রাখিয়া দেব সহায়তা হইতে নিজেদের বঞ্চিত করি! তাহা যদি না হয়, আমাদের চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে, অসীম আত্মার সহিত আমাদের ঐকাত্ম্য সম্বন্ধ এমন জীবন্তরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, আমাদের অন্তরের দ্বার অবারিত রাখিয়া, দিব্য প্রবাহের পথ সুগম করিয়া দিয়া, আমরা এতাদৃশ দৈব সহায়তা, দৈবশক্তি, দৈবাদেশ লাভে সমর্থ হই যে ক্রমে আমরা দেবতুল্য মনুষ্য হইয়া উঠিতে পারি।

দেবতুল্য মনুষ্য কাহাকে বলা যায়? যে মনুষ্যের অন্তরে, ইহজীবনেই, দৈবশক্তি প্রকাশ পাইতে থাকে তিনিই দেবতুল্য মনুষ্য। অজ্ঞানবশতই অধিকাংশ

মনুষ্য নিজের ন্যায্য প্রাপ্য দেব বিভব হইতে বঞ্চিত থাকিয়া দীন হীন অপরিবর্দ্ধিত জীবন যাপন করে। তাহাদের কখনই নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মায় না।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐকাত্ম্য সম্বন্ধ মানবজাতি আজিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, অজ্ঞানবশত অন্তরের দ্বার অবারিত রাখিতে আজিও শেখে নাই, এইহেতু তাহাদের অন্তরে দৈবশক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না। যখন আমরা নিজেকে কেবলমাত্র মানুষ বলিয়া মানি তখন আমরা কেবলমাত্র মানুষের ক্ষমতা লইয়া জীবন যাপন করি। যখন পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া চলিতে শিখি, তখন আমরা দৈবশক্তি লাভ করিয়া তদনুরূপ জীবন যাপন করি। আমরা যে পরিমাণে আমাদের অন্তরের দ্বার অবারিত রাখিয়া দিব্য প্রবাহের পথ সুগম করিয়া দিই, ঠিক সেই পরিমাণে আমাদের সাধারণ মনুষ্যত্ব দেবত্বের দিকে অগ্রসর হয়।

আমার এক বন্ধুর একটি পদ্ম সুশোভিত সরোবর আছে। দূরবর্ত্তী পর্ব্বত পাদস্থিত এক জলাধার হইতে জল আনয়ন করিয়া সরোবরটী জলপূর্ণ রাখা হয়; জল প্রণালীর মুখের কপাটদ্বারা জল প্রবাহের পরিমান নিরূপিত হয়। স্থানটী অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ভরপূর। প্রস্ফুটিত পদ্মগুলি নির্ম্মল স্বচ্ছ জলবক্ষে সুখশায়িত। সরোবর তীরে গোলাপ এবং নানা জাতি বনফুল ফুটিয়া আছে। কত শত পাখীরা সরোবরে স্নান ও জলপান করিতে আসে, ঊষাকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত পাখীদের গান শোনা যায়। মধুমক্ষিকারা অবিরাম বন-ফুলে-মধু সঞ্চয় করিতেছে। সরোবরের পশ্চাদ্দিকে, দৃষ্টির সীমান্ত প্রসারিত এক কুঞ্জবন, তাহাতে নানা জাতীয় বনফল লতা ও কাঁটাগাছ।

আমার বন্ধু দেবতুল্য লোক উদারচিত্ত; তিনি তাঁর বাগানের কোনও খানে "প্রবেশ নিষেধ" বা "অনধিকার প্রবেশকারী দণ্ডিত হইবে" এরূপ কোন তাড়না বাক্য লিখিয়া রাখেন নাই। কুঞ্জবনের মধ্য দিয়া পদ্ম সরোবরে আসিবার পথের প্রবেশ দ্বারে সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে "পদ্ম সরোবর দেখিতে সকলে আসুন।" আমার বন্ধুকে সকলে ভালবাসে। যদি বল কেন? তাহার কারণ, কেহ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি সকলকে এমন ভালবাসেন যে, তাঁর জিনিস সকলে নিজের জিনিসের মত করিয়া দেখে।

এই মনোরম স্থানটিতে প্রায়ই দেখা যায়, কোথাও একদল বালক বালিকাদের হাস্য কোলাহলময় খেলা চলিতেছে; কোথাও শ্রান্ত ক্লান্ত নর নারীরা বসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত লোকেরা বিশ্রাম করিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহাদের মুখের ভাবে একটি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, যেন তাহাদের সমস্ত ভার নামিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ অস্ফুটস্বরে বলিতে বলিতে যায় "ভগবান কর্ত্তার ভাল করুন।" অনেকে এই স্থানটিকে স্বর্গের উদ্যান বলেন। আমার বন্ধু ইহাকে তাঁর আত্মার উদ্যান বলেন, আর এইখানে নির্জ্জনে অনেকটা সময় যাপন করেন। কতবার দেখি, যখন সকলে চলিয়া গিয়াছে, তিনি একাকী এইখানে বেড়াইতেছেন, কিম্বা নির্ম্মল জোৎস্নালোকে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া বনফুলের সৌরভ উপভোগ করিতেছেন। তাঁর অতি সুন্দর সরল প্রকৃতি।

তিনি বলেন, এইস্থানে জীবনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহার সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহার জীবনে তিনি যে সকল বড় বড় কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সে সমস্ত কার্য্যের সাধনোপায় এইখানেই উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এই স্থানটী হইতে যেন করুণা, হিতৈষণা, আরাম ও স্বচ্ছন্দতা মিশ্রিত একটি ভাব চতুষ্পার্শে বিকীর্ণ হইতেছে। কুঞ্জবন বেষ্টিত পুরাতন প্রস্তর-প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া, এই রমণীয় স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গো মেষাদি পশুরাও যেন মনুষ্যের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন বাঞ্ছিত বস্তুলাভে তাহাদের মুখ হাস্য-বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

সরোবরের জল-প্রণালীর কপাট সর্ব্বদা এরূপভাবে খুলিয়া রাখা হয় যাহাতে সরোবর পূর্ণ থাকিয়া তাহা হইতে একটি স্রোত বাহির হইতে পারে। পার্ব্বত্য ঝরণার বিমল জলপূর্ণ এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কত মাঠ কত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, গো মেষাদি কত পশুও তৃষ্ণা নিবারণ করে, কত শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করে।

একবার, কোন কার্য্যবশতঃ, আমার বন্ধুর একবৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইল। তখন তিনি তাঁর বাড়ি বাগান সমস্ত একজনকে ভাড়া দিলেন। যিনি ভাড়া লইলেন তিনি একজন ঘোর সংসারিক লোক, যাহাতে কোনও লাভ নাই এমন কাজের জন্য তাঁর একটু অবসর ছিল না। জলপ্রণালীর কপাট বন্ধ হইয়া গেল, পার্ব্বত্য স্ফটিকজল আসিয়া আর পদ্মসরোবর ছাপাইয়া স্রোত বহিত না। কুঞ্জবনের প্রবেশদ্বারে "পদ্ম সরোবর দেখিতে সকলে আসুন" এই সাদর আহ্বান লিখন মুছিয়া ফেলা হইল। সরোবর তীরে বালক বালিকাদের আনন্দপূর্ণ খেলা—নরনারীদের সৌন্দর্য্য ও শান্তিসুখ উপভোগ বন্ধ হইল। সকল জিনিসের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল, জীবনদায়ক জলের অভাবে পদ্মবৃন্ত শিথিল হইয়া পড়িল, সরোবর তলে কর্দ্দমোপরি পদ্ম লুণ্ঠিত হইল। স্বচ্ছ সলিলে ক্রীড়াকারী মাছেরা মরিতে লাগিল, মাছের পূতিগন্ধে কেহ সরোবরের নিকটে যাইতে চাহেনা। সরোবর তীরে আর ফুল ফোটে না। পাখীরা আর জলপান ও স্নান করিতে আসে না। মধুমক্ষিকার গুণগুণধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না। সরোবর হইতে প্রবাহিত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী শুকাইয়া গিয়াছে। গো মেষাদি পশুরা আর নির্ম্মল পার্ব্বত্যজল পান করিতে পায় না।

ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সরোবরের অবস্থার ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিবার কারণ জলপ্রণালীর কপাট বন্ধ হওয়া। পর্ব্বতস্থিত জলাধার সরোবরের জীবন স্বরূপ; সেই জলাধার হইতে জল আসিবার পথ রুদ্ধ থাকাতেই সরোবরের এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। জীবনস্বরূপ জলাধারের পথ রুদ্ধ থাকাতে কেবলমাত্র সরোবরেরই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে এমন নহে, পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র সকল ও তীরে বিচরণকারী গো মেষাদি পশু স্রোতস্বিনীর জল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

এইস্থলে, মনুষ্য জীবনের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না? সকল জীবনের মূলাধার অসীম আত্মার সহিত আমাদের আত্মার যোগ, আমাদের ঐকাত্ম্য সম্বন্ধ যে পরিমাণে উপলব্ধি করি, দিব্য প্রবাহের পথে আমাদের অন্তরের কপাট যে পরিমাণে

উন্মুক্ত রাখি, সেই পরিমাণে আমরা সর্ব্বোচ্চ সর্ব্ব-শক্তিমান ও সর্ব্ব সুন্দরের সহিত সর্ব্বত্রে মিলিত হই। আমরা যে পরিমাণে এইরূপে মিলিত হইতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের হৃদয় পরিপূরিত হইয়া ছাপাইয়া উঠিতে থাকে, যাহারা আমাদের সংস্পর্শে আসে তাহারাও হৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত স্রোতে সিক্ত হইয়া যায়। আমার বন্ধুর হৃদয়ই তাঁহার পদ্ম সরোবর, বিশ্বের সমস্ত সত্য, শিব ও সুন্দর বস্তু তাঁহার প্রেম প্রবাহে সিক্ত হয়। জীবনের মূলাধারের সহিত আমাদের ঐক্য উপলব্ধি করিতে আমরা যতই অপারক হই, অন্তরের দ্বার রুদ্ধ রাখিয়া দিব্য প্রবাহের গতি যতই রোধ করি, তদনুসারে আমাদের মনের এমন অবস্থা ঘটে যে, আমরা কোথাও ভাল কিছু দেখিতে পাইনা, কিছুতে কোন সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না, নিজের শক্তি হারাইয়া ফেলি। মনের ঈদৃশ অবস্থা ঘটিলে, তখন যাহারা আমাদের সংস্পর্শে আসে, তাহারা আমাদের নিকট হইতে ভাল কিছুই পায় না, বরং তাহাদের অনিষ্ট ঘটে। ভাড়াটিয়ার হাতে পড়িয়া পদ্ম-সরোবরের সহিত তোমার ও আমার জীবনের প্রভেদ এই—সরোবরের নিজের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে তাহার অন্তর্মুখী প্রবাহের পথের কপাট খুলিয়া রাখিয়া মূলাধারের সহিত নিজের যোগ রক্ষা করে ; এ সম্বন্ধে সে নিরুপায় এবং পরমুখাপেক্ষী। তোমার ও আমার সে ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতা আমাদের অন্তরে নিহিত আছে, আমরা আমাদের অন্তর্মুখী দিব্যপ্রবাহের পথ, স্বেচ্ছানুসারে মুক্ত বা রুদ্ধ রাখিতে পারি।

PRAYERS.

IX.

O Lord my God, how can I describe Thy glory? I do not know where to begin and where to end. Thou dwellest in that light which no man can approach unto. But the nearer I come to the end of my days on this earth, closer and closer do I feel Thee in my soul. My hair once dark has now grown white, the lustre of my eyes has become dim, my body is daily growing more and more feeble, but Thy mercy knows no decline. At this very moment Thy mercy makes its way into my inner being, and invigorates my soul with fresh strength and life. O thou Lord of mercy, lead me to thy abode of bliss. I now yearn for nothing but Thee. Here I am keenly agitated by praise and blame, by the sorrows of life and the pangs of separation from those near and dear to me. Thou alone art my Refuge. Thou bearest the burden of the whole universe and wilt Thou not bear the burden of this little heart of mine? Thou, O Lord, art my hope and stay. When Thou art near me, misery cannot approach nor can any danger assail me, but when Thou art far away, even the point of a blade of kusa grass becomes as grievous as the heavy iron goad is to the elephant in the hands of its driver. O Lord my God, sorely afflicted by the tumult of the world, I come to Thee and seek Thy shelter; do Thou make me worthy of thy abode of bliss. Amen.

Santih. Santih.

X.

O Lord our Saviour, save us from the torture and agony of sinfulness and all moral obliquity. May we all fully obey Thy law of righteousness and be ever

guiltless before Thee. We have known Thy love for us. An in lands blessed with righteousness and knowledge is Thy mercy manifest, so in countries dark and degraded is Thy mercy also apparent. A bit of wood that catches fire is soon reduced to ashes and then cooled: likewise the sinner's heart, burnt by the fire of agony, becomes the very dust of Thy path when the waters of Thy mercy are poured upon it. Thy love, Thy mercy are without bounds. We have nothing to fear if we put our trust in Thy goodness. To seek Thy refuge is the only remedy for all pain and anguish. O Lord Supreme, be Thou our help.

Santih. Santih.

নানা কথা।

বিগত গুডফ্রাইডের অবকাশ উপলক্ষে কলিকাতাস্থ টাউনহলে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বিশেষ উদ্‌যোগে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বির মত আলোচনা করিবার জন্য (Convention of Religion) ধর্ম্মসঙ্ঘের তিনদিবস ব্যাপী অধিবেশন হইয়াছিল। ১৮৯৩ অব্দে আমেরিকার সিকাগো নামক স্থানে যে Parliament of Religion বসিয়াছিল, ক্ষুদ্রাকারে ইহা তাহারই অনুরূপ। হিন্দু মুসলমান জৈন বৌদ্ধ খৃষ্টান ও য়িহুদি প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ দূরদুরান্তর হইতে আসিয়া সৎভাবে বিশেষ আগ্রহের সহিত এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। দারবঙ্গের অধিপতি সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাস্থল শ্রোতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিবর্গে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পরস্পরের প্রতি যেরূপ উদার ভ্রাতৃভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে এই ধর্ম্মসঙ্ঘ স্থায়ীত্ব লাভ করিলে দেশের যে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

উদ্বোধন সঙ্গীত।

জগতের পতি, অতিথি তোমার দ্বারে।
অগতির গতি, পদে নতি বারে বারে॥
স্বরূপেতে তুমি রূপের অতীত,
পুরুষ অনাদি উপাধি রহিত,
সাধকের সাধে কতই কল্পিত,
যুগে যুগে রূপ নাম যে জল্পিত,
সর্ব্বনাম তাঁর অবস্থিত সর্ব্বাধারে॥

২

পরব্রহ্মে তুমি পরম ঈশ্বর,
ব্রহ্মা বিষ্ণু জিষ্ণু বহ্নি মহেশ্বর,
কেহ নহে অন্য তুমিই চৈতন্য,
গণেশ রণেশ রাম নামে গণ্য,
একে ভিন্ন ভিন্ন মান্য শূন্যে বা সাকারে॥

৩

জগদ্ধাত্রী মাতৃ দুর্গা কালী মায়া,
অন্নদা জ্ঞানদা লক্ষ্মী পদ্মালয়া,
কালা বনমালী রাধা হৃদি রথী,
পাঞ্চালীর সখা পার্থের সারথি,
বিশ্বরূপ ধারী মুকুন্দ মুরারি হরে॥

৪

শুদ্ধবোধি বুদ্ধ, পিঙ্কন অজিন
সিতাম্বর দিগম্বর তুমি দেব জিন,
তুমি খোদাতাল্লা আল্লা মোক্ষদাতা,
ঈশা মুসা যীশু ত্রাতা ভাবে ভ্রাতা,
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র গুরুগ্রন্থ একাধারে॥

৫

রম্য দৃশ্য বিশ্ব সমাজ আমার,
মস্‌জিদ, মন্দির, গুরুদরবার,
অর্চ্চনার চর্চ্চ, সিনাগগ্, মঠ,
সর্ব্বতীর্থ যোগ জাহ্নবীর তট,
পরিচয় নয়, পর ভেবনারে কারে॥

৬

যে পথে যে যাই, গতি এক ঠাঁই,
তোমা বিনা আর দ্বিতীয় তো নাই,
ডাকি যাই বলে ডেকে নাও কোলে,
ছলে ভোলা মন, ধাঁধা খেয়ে দোলে,
মাতা পিতা পতি গুরু প্রভু সখা,
কর্ত্তা হর্ত্তা পাতা সবই তুমি একা,
আমা হ'তে তুমি গো আমার এ সংসারে;
সম্প্রদায় ভেদ করিলে উচ্ছেদ রামকৃষ্ণ অবতারে।

শ্রদ্ধেয় সারদা বাবু তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলিলেন যে সমগ্র জগতের অধিকাংশ অধিবাসী যে যে ধর্ম্মের অন্তর্ভূত সেই সকল ধর্ম্মের সমুত্থান ভারতেই ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষ ঐ সকলেরই আদি-জননী। ঈশ্বরোপাসনা ও প্রেম (worship and love) সকল ধর্ম্মেরই মূলমন্ত্র। বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে আকারগত বৈষম্য থাকিলেও সকলের মূল সেই একেরই দিকে। কিন্তু আমরা অন্যান্য ধর্ম্মকে উদারভাবে নিরীক্ষণ করি

না ; বাহ্য বৈষম্য দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হই। অনেক সময়ে আমরা নিজ নিজ ধর্ম্মকেও সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই সকল অভাব দূর করিবার জন্য এই ধর্ম্ম-সঙ্ঘের সূচনা। অবতার ও সাধুপুরুষের আবির্ভাব সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে। দুর্নীতি দূরীকরণ এবং জনসমাজের উন্নতিবিধান তাঁহাদের সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য। আমরা ভ্রাতৃভাবে এখানে মিলিত হইয়াছি, আমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাউক। জগতের কল্যাণসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য হউক। আমরা ভ্রাতৃপ্রেমে যেন পরস্পর মিলিত হইতে পারি।

দারবঙ্গের অধিপতি সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, আমরা পরস্পরের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মমত আদান প্রদান করিবার জন্য মিলিয়াছি। বৈষম্যের আবরণ ভেদ করিলে আমরা পরস্পরের যে কত নিকটে তাহা অনুভব করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এরূপ সম্মিলন ভারতে অশ্রুতপূর্ব্ব নহে। অতীব পুরাকালে (ব্রাহ্মণ্য যুগে) ব্রাহ্মণেরা ইতরজাতিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার প্রদান না করিলেও খৃষ্টপূর্ব্ব-ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে হিন্দু-সমাজের ভিতরে পরিবর্ত্তনের ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। রাজগির (বিহার) নামক স্থানে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে এইরূপ সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে বৈশালিতে (মজঃফরপুর) খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৪৩ অব্দে অনুরূপ সভা সংগঠিত হয়। তৃতীয় সভা পাটলিপুত্র নগরে খৃঃ পূঃ ২২৫ অব্দে রাজা অশোকের নিরস্তৃত্বে এবং চতুর্থ সভা জলন্ধরে (পঞ্জাব) ৭৮ অব্দে রাজা কণিষ্কের সময় আহূত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে প্রতি পঞ্চমবর্ষে ধর্ম্মমত আলোচনা করিবার জন্য অনুরূপ সভার অধিবেশন হইত। জৈনগণও মধ্যে মধ্যে এইরূপ সভা আহ্বান করিতেন। দ্বিতীয় শতাব্দিতে মথুরাতে তাঁহাদের কর্ত্তৃক যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের সংস্কারক কুমরিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য সভা অহ্বান করিয়া নিজ নিজ মত লইয়া অপরের সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। বাদশাহ আকবরও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিকে ডাকাইয়া সভা বসাইতেন।

আমরা এই ধর্ম্ম-সঙ্ঘে আজ মিলিত হইয়াছি। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যকে যাহা ধরিয়া থাকে এবং ঈশ্বরের সহিত যাহা দ্বারা মনুষ্যের যোগ রক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই অর্থের যাহাতে সার্থকতা হয়, অদ্যকার আলোচনা সেই ভাবে করিতে হইবে। যদিও আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ঈশ্বর আমাদের সকলেরই নেতা। আমাদিগকে সর্ব্ববিধ বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। মানব সমাজ বিভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেও এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের দিকে সকলেরই গতি। সেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে বিলম্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ধর্ম্মের ভাব "ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ।" এই সত্যটি আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, জীবনে তাহা সাধন করিতে হইবে।

আমরা বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার বাহ্য পূজা পিতৃপিতামহগত প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়া থাকি। তাহার মধ্যে প্রণালী ও আকারগত বৈষম্য থাকিলেও আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে সকলে প্রকৃত শান্তিসুখ উপভোগ করি। সাধন প্রণালী লইয়াই জগতে মতভেদ চলিতেছে কিন্তু অন্তরের ভিতরে সেই একই পবিত্রতা বিরাজমান।

আচার অনুষ্ঠান বা কোন বাহ্য-অবলম্বন (Symbols) যাহার সাহায্যে উপাসনা সাধিত হয়, প্রথম আবিষ্কারের সময়ে তাহা অর্থপূর্ণ ও অধ্যাত্ম-জীবনের সহায় ছিল, কিন্তু কালক্রমে উহারা অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের সমস্ত অন্তঃসার চলিয়া গিয়াছে। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের মধ্যেই এই ভাব দেখা যায়। আমরা পরস্পরে ধর্ম্মের বাহ্য পরিচ্ছদ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত ; কিন্তু ধর্ম্মমাত্রেরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখিব আমরা সকলে এক। প্রীতি পবিত্রতা, সত্য, নিষ্ঠা, সততা, ধীরতা, সেবা, ক্ষমা ভ্রাতৃভাব, আশা, আনন্দ, শান্তি এই সকল লইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে কোন দ্বন্দ্ব নাই। ফলত এই সকলের উৎকর্ষই জীবনকে পবিত্রতম করিয়া তোলে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে জেরোয়াষ্টর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দেখা যায় যে এক ঈশ্বর যাহা কিছু কল্যাণের সৃষ্টি করিতেছেন, বিপরীত ধর্ম্মী অন্য দেবতা কেবলই অনিষ্ট ও অকল্যাণ প্রসব করিতেছেন। যাঁহারা সাধুজীবন যাপন করিবেন তাঁহারা মৃত্যুর অন্তে চিন্তা বাক্যে ও কার্য্যে শাশ্বত সুখ উপভোগ করিবেন। যাহারা পাপে নিরত রহিল তাহারা যন্ত্রণাময় নরকে স্থান পাইবে! পাপ পুণ্যের ভাব এই ধর্ম্মে সুন্দরভাবে চিত্রিত।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে গৌতম বলিয়াছিলেন সাধু সেবা কর, অসতের সেবা পরিহার কর, সম্মানার্হকে সমাদর কর, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, প্রকৃত শিক্ষা লাভ কর, সদালাপী হও, পিতামাতার সেবা কর, স্ত্রী পুত্রকে পোষণ কর, জীবিকার জন্য সাধু পথ অবলম্বন কর, দানশীল হও, সাধুজীবন অতিবাহিত কর, আত্মীয়ের অভাব বিমোচন কর, পাপ হইতে বিরত হও,

মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ কর, সৎকার্য্যসাধনে অক্লিষ্ট হও, শ্রদ্ধাবান ও বিনয়ী হও, পরিতুষ্ট থাক, কৃতজ্ঞতা অভ্যাস কর, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর, সঙ্ঘের সভ্যগণের সহিত মিলিত হও, সৎপ্রসঙ্গ কর, মিতাচারী হও, সতী ও সংযমী হও, নির্ব্বাণলাভে আশান্বিত থাক, পৃথিবীর ক্ষতি লাভে অটল থাক। তাহাহইলে সমস্ত জীবন নিরাপদ থাকিতে পারিবে ও প্রকৃত শান্তিসুখ উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে। প্রকৃত পক্ষে আত্মবিজয় ও মৈত্রী বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাণ।

মুসলমান ধর্ম্ম বলেন ঈশ্বরের বিচারে সন্তুষ্ট থাক। মহম্মদ পাঁচটি কর্ত্তব্যের আদেশ দিয়াগিয়াছেন (১) বিশ্বাস কর ঈশ্বর এক (২) পাঁচবার প্রার্থনা কর, (৩) দান কর (৪) রমজান মাসে উপবাস কর (৫) জীবনে একবার মক্কাতীর্থে গমন করিও। শেষ বিচার দিনের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইও না। সকলকে শিক্ষা দাও যে জগতে আমরা ক্রীড়া কৌতুক করিতে আসি নাই, দায়িত্বপূর্ণ জীবন লইয়া আসিয়াছি। এই ধর্ম্মে আছে, মুসলমান মাত্রেই পরস্পরের ভ্রাতা। যাঁহারা ধনশালী তাঁহারা দরিদ্রের রক্ষক, এমন কি দরিদ্রেরা ধনীর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিবার অধিকারী। ধনী দরিদ্রের ভিতরে কোন প্রভেদ নাই; এমন কি ধনী তাঁহার আয়ের এক চত্বারিংশ দান করিতে বাধ্য।

ঈশা প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন। তেত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার উপদেশ এই, ঈশ্বর যে কেবল আমাদের স্রষ্টা পাতা তাহা নহে, তিনি আমাদের পিতা। তিনি তাঁহার প্রতি সন্তানকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রয়াসী। তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার শিক্ষা আপনার জীবনের আদর্শে শিষ্যগণের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঈশার মত জগতে প্রচার করিলেন। ঈশা তিন বৎসর ব্যাপী প্রচারে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রুশে প্রাণ দিলেন। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব তাঁহার ধর্ম্মের চরম শিক্ষা। খৃষ্ট ধর্ম্মে পাপের ক্ষমা ও অনন্ত-জীবনের অশাবাণী সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্ম, আমি যাহার অন্তর্গত, সুদূর অতীতের সঙ্গে তাহার যোগ। ভারতের প্রায় ২৭ কোটি লোক এই ধর্ম্মের অন্তর্গত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানুসারে বিভিন্ন অবতার ধরিয়া এই হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে নানা শাখা প্রশাখা। নিরক্ষরের জন্য ধর্ম্মের এক প্রকার বিধান, উন্নত লোকের জন্য অন্যরূপ। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বিরাজমান, প্রকৃতির উপাসনায়ও তাঁহার উপাসনা হয়, তিনি অণু পরমাণুতে বিদ্যমান। মনু বলিয়াছেন, ধৃতি ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। দেহের বন্ধন হইতে আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া ঈশ্বর যাঁহা হইতে এই আত্মার উৎপত্তি তাঁহাতেই লইয়া যাইতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মে সংযম আত্মত্যাগের ও নীতির সুন্দর বিধান রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, বিশ্বজনীন ও সর্ব্বজনীন ভাব ইহাতে পরিকীর্ত্তিত। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের মতে হিন্দুদিগের মধ্যে ৭২ টি শাখা; কিন্তু ঐ শাখাগুলি আবার নানা প্রশাখায় বিভিন্ন।

পরিশেষে যে সকল প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত, তাঁহাদিগকে আমি সাদরে গ্রহণ করি এবং আশা করি পরস্পরের ধর্ম্মভাব আলোচনা শ্রবণে আনন্দ লাভ করিয়া এখান হইতে তাঁহারা প্রত্যাবৃত হইবেন। এই সভা ভবিষ্যতে যে কল্যাণপ্রদ হইবে তৎসম্বন্ধে আশান্বিত হইতেছি। সেই ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম তাহার অনুচরগণের চরিত্রকে বিশোধিত করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক করিয়া তুলিতে পারে। ঈশ্বর প্রীতি ও মনুষ্যে ভালবাসা, ইহাই একদিন জগতের ভাবী ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। এই ধর্ম্মসঙ্ঘ সেই উদ্দেশ্য সাধন করুন ইহাই প্রার্থনা।

সভাপতি এই বলিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধি নিজ নিজ ধর্ম্মমত লিখিয়া পাঠ করেন। এইরূপে তিন দিবস অতিবাহিত হয়। বক্তাগণের মধ্যে কতকগুলির নির্ব্বাচন দোষশূন্য না হইলেও এই প্রথম বৎসরে যাহা হইয়াছে তাহা আশাতীত বলিতে হইবে। উপস্থিত শ্রোতাগণের মধ্যে বহুঅংশের সহানুভূতি এই ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতি নিরীক্ষণ করিলাম। বক্তাগণের বিবৃত বিষয় শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। ভবিষ্যতে আমাদের তাহা আলোচনা করিবার ও উহার সারাংশ দিবার ইচ্ছা রহিল। প্রতিদিন সঙ্গীত করিয়া কার্য্যারম্ভ হয়। শেষ দিনের সঙ্গীত বিশেষ উদারতা ব্যঞ্জক বলিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ফিরে এসেছি, আমি এসেছি হে ফিরে এসেছি
কর্ম্মক্ষেত্র ঋষিভূমে হোম সৌরভে এসেছি
যুগযুগান্ত আঁধারভেদি ভারতে পুনঃ এসেছি।
দিব্য-ধূলি জনমভূমি ভারতে ফিরে এসেছি
আমি তোর মা নাই, তার মা নহি আমি নিখিল জগন্ময়ী
ভুবনভূষণ আলোক রূপে জগত জননী এসেছি
পুণ্যপূতে সিন্ধু সলিলে জর্ডন-গঙ্গা-কলকল্লোলে
সবে প্রেম-সূতে গেঁথে একই সাথে আবার দেখা দিয়েছি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নববর্ষের দান প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী হইতে পারিবারিক দান	...	৮৲
শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	...	১০৲
„ সৌদামিনী দেবী	...	২৲
„ সুকেশী দেবী	...	১৲
„ চারুবালা দেবী	...	১৲
„ ইরাবতী দেবী	...	১৲
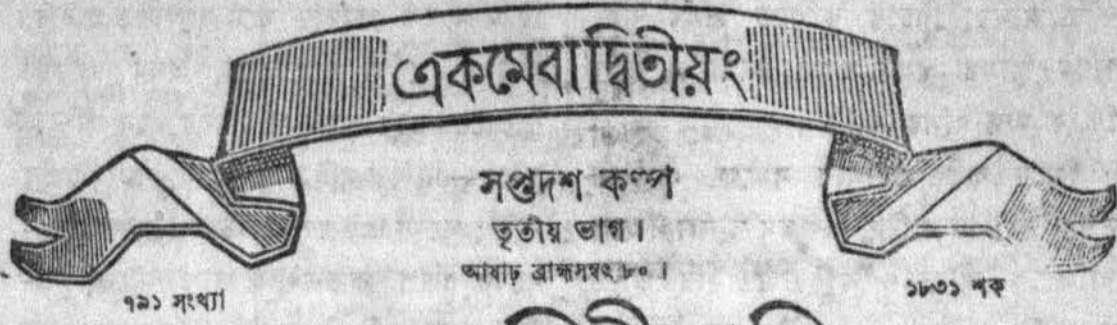
আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमदध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

মঙ্গল।

চতুর্থ উপদেশ।

ধর্ম্মনীতির প্রকৃত মূলতত্ত্ব।

সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী, দার্শনিক পদ্ধতি সমূহের শুধু ভ্রম দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, পরন্তু সেই ভ্রমসমূহের মধ্যে যে সত্য মিশ্রিত আছে তাহা তিনি দেখিতে পান, এবং সেই সত্যগুলিকে সেই সব ভ্রম হইতে বিনির্ম্মুক্ত করেন। বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহের বিক্ষিপ্ত সত্যগুলি একত্র মিলিত হইয়া একটি সমগ্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং সেই সত্যকে, প্রত্যেক পদ্ধতিই একটা বিশেষ দিক দিয়া প্রদর্শন করে। আমরা যে সকল নৈতিক পদ্ধতি খণ্ডন করিলাম, তাহা পস্পরর বিরোধী হইলেও, তাহাদের মধ্যে সমগ্র ধর্ম্মনীতির মূল-উপাদানগুলি নিহিত আছে। সমগ্র নৈতিক ব্যাপারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, শুধু ঐসকল উপাদানকে একত্র করা আবশ্যক। ফলত সমস্ত দর্শনের ইতিহাস—মানসিক ব্যাপার-সমূহের বিশ্লেষণ কিংবা বিশ্লেষণের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন পদ্ধতি-বিশেষের মতে অন্ধ না হইয়া, সমগ্র মানব-আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের মনে যে সকল ধারণা ও ভাব উৎপন্ন হয় তাহাই আমরা যথাযথরূপে একত্র সংগ্রহ করিব।

কতকগুলি কার্য্য আমাদের প্রীতি-কর এবং কতকগুলি কার্য্য অপ্রীতি-কর; কতকগুলি উপকারী, ও কতকগুলি হানিজনক;—এক কথায়, সেই সকল কার্য্যের সহিত আমাদের স্বার্থের যোগ। যে সকল কার্য্য আমাদের হিতজনক সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরা আনন্দিত হই, এবং যাহাতে আমাদের হানি হয়—সেই-রূপ কার্য্য আমরা পরিবর্জ্জন করি। যে সকল কার্য্যে আমাদের স্বার্থ সাধিত হয় আমরা নিয়ত সেই সকল কার্য্যেরই অনু-সরণ করি।

এই ব্যাপারটি সর্ব্ববাদিসম্মত;—আরও একটি ব্যাপার আছে যাহা উহারই মত অবিসম্বাদিত।

এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহার সহিত আমার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহাতে আমাদের কি স্বার্থ আছে

তাহা আমরা বিচার কলিতে সমর্থ নহি, অথচ আমরা সেই সকল কার্য্যকে ভাল কিংবা মন্দ বলিয়া থাকি।

মনে কর, তোমার সমক্ষে একজন সশস্ত্র বলবান্ ব্যক্তি, একজন দুর্ব্বল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি মারপীট করিল, এবং তাহার গাঁটের কড়ি হরণ করিবার জন্য তাহাকে হত্যা করিল। এই কার্য্যে তোমার নিজের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগিল না, অথচ তোমার মন ঘৃণা ও রোষে পূর্ণ হইল; সেই হত্যাকারীকে ধৃত করিয়া পুলিসে সোপর্দ করিবার জন্য, তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে। যাহাতে সে কোন না কোন রূপে দণ্ডিত হয় তাহার জন্য তোমার আন্তরিক ইচ্ছা হইল—এবং তুমি মনে করিলে—এইরূপ দণ্ডবিধান করা ন্যায়-সঙ্গত কার্য্য; যতক্ষণ না তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইল ততক্ষণ তোমার রোষ প্রশমিত হইল না। আবার আমি বলি, এস্থলে তোমার নিজের কোন প্রত্যাশাও ছিল না, ভয়ও ছিল না। তুমি যদি কোন দুর্গম দুর্গের মধ্যে থাকিয়া, তাহার উচ্চ চূড়া হইতে এই হত্যাকাণ্ড দেখিতে, তাহা-হইলেও তোমার মনে এইরূপ ভাবই উৎপন্ন হইত।

একটা হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তোমার মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহারই একটা মোটামুটি ছবি উপরে প্রদর্শিত হইল। এই ছবির মধ্যে যে সকল বিভিন্ন রেখার সমাবেশ আছে, তৎম্বন্ধে একটু বিশ্লেষণ ও একটু বিচার করিয়া দেখিলেই একটা দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া কোন্ ভাবটি তোমার মনে প্রথম উদয় হইল?—অবশ্য, ঘৃণামিশ্রিত রোষের ভাব—একটা স্বাভাবিক আতঙ্ক তোমার মনে সঞ্চারিত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে, এমন একটা ধিক্কারের ভাব স্বতই আমাদের মনে জন্মিতে পারে—যাহার সহিত স্বার্থের কোন সংস্রব নাই; মনের এইরূপ একটা শক্তি আছে—মনের এরূপ কতকগুলি ভাব আছে, যা-হার লক্ষ্য আমি নিজে নহি! আমাদের মনে এমন একটা বিদ্বেষের ভাব, এমন একটা বৈমুখ্যের ভাব, এমন একটা আতঙ্কের ভাব আছে, যাহা আমাদের নিজের অনিষ্টাশঙ্কা হইতে উৎপন্ন হয় না, প্রত্যুত এমন সকল কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয় যাহা আমাদের হইতে বহুদূরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং যাহার আঘাত আমাকে একটুও স্পর্শ করিতে পারে না;—সেই সকল কার্য্যকে যে আমরা ঘৃণা করি, তাহার একমাত্র হেতু, আমরা সেই সমস্ত কার্য্যকে মন্দ বলিয়া বিবেচনা করি।

হাঁ আমরা সেই সকল কার্য্যকে মন্দ বলিয়া বিবেচনা করি। সেই সব কার্য্য আমাদের মনে যে সকল ভাব উৎ-পাদন করে, সেই সকল ভাবের মধ্যে একটা বিচারক্রিয়া প্রচ্ছন্ন আছে। যে সময়ে কোন কার্য্য দেখিয়া তোমার মনে ঘৃণা ও রোষের উদয় হয়, তখন যদি কেহ বলে, তোমার এই নিঃস্বার্থ রোষ তোমার একটা বিশেষ দৈহিক গঠনের ফল, এবং ঐ কার্য্য আসলে ভালও নহে মন্দও নহে—তখন এই ব্যাখ্যার প্রতি তুমি নিশ্চয়ই বিমুখ হও, তুমি তাহাতে সায় দিতে পার না; তুমি বলিয়া ওঠো, ঐ কার্য্যটি স্বতই মন্দ; তুমি তখন শুধু তোমার মনের ভাবমাত্র প্রকাশ কর না, তোমার বিচারে যাহা মনে হয় তাহাই তুমি ব্যক্ত করিয়া থাক। তাহার পর দিন তোমার মনের উত্তেজনা উপশমিত হই-

লেও ঐ কার্য্য তোমার বিচারে মন্দ বলিয়াই উপলব্ধি হয়। ঐ কাজটা যে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই মন্দ, তাহা ছয় মাস কাল পরেও তোমার মনে হয়; তাহার কারণ, —তোমার বিবেচনায়, কাজটা স্বতই মন্দ। শুধু তাহা নহে, তোমার বিবেচনায় ঐরূপ কাজ না করাই উচিত।

কাজটা আসলে মন্দ এবং উহা না করাই উচিত—এই যে যুগল বিচারক্রিয়া —ইহাই তোমার ঘৃণা ও রোষের মূলে অবস্থিত। যদি কাজটা আসলে খারাপ না হয়, এবং যদি ঐ কার্য্যকারী ব্যক্তি ঐ কাজটা না করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে, তুমি ঐ কার্য্যের দরুণ যে ধিক্কার ও রোষ অনুভব কর তাহা তোমার শুধু একটা দৈহিক চেষ্টামাত্র—এইরূপ মনে করা যাইতে পারে;—উহা এমন একটা ব্যাপার যাহাতে কোন নৈতিক ভাবের সংস্রব নাই; একটা প্রাকৃতিক ভীষণ কাণ্ড ঘটিলে তোমার মনে যেরূপ ভাবের সঞ্চার হয় ইহা কতকটা সেইরূপ ধরণের ভাব। কিন্তু ন্যায্যভাবে তুমি ঐ কার্য্যকারীর কার্য্যকে ভালমন্দ-নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করিতে পার না। ঐ কার্য্যকারীর প্রতি যে ব্যক্তি ঘৃণা ও রোষ অনুভব করে, তাহার মনে এই যুগল বিশ্বাস দুটিও থাকে যে,—ঐ কার্য্য আসলে খারাপ, এবং ঐ কার্য্য করা উচিত নহে।

কার্য্যটা আসলে খারাপ এবং উহা করা উচিত নহে—এই কথাটি বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝায় যে, ঐ কার্য্যকারী ব্যক্তি জানে যে, সে খারাপ কাজ করিতেছে,—সে ধর্ম্ম-নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে; তাহা না হইলে, তাহার এই কাজটা পশুবৎ অন্ধশক্তির কাজ হইত, নীতিশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির কাজ হইত না; তাহা হইলে, মাথায় পাথর পড়িলে, যেমন পাথরের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও ক্রোধ উৎপন্ন হয় না, সেই কার্য্যকারীর প্রতিও সেইরূপ আমাদের ঘৃণা ও ক্রোধ উৎপন্ন হইত না।

তাছাড়া, যে ব্যক্তি এই ঘৃণা ও ক্রোধের পাত্র তাহার প্রকৃতিগত একটি বিশেষ লক্ষণ আছে; অর্থাৎ সে স্বাধীন পুরুষ; সে যে কাজ করিয়াছে সে করিতেও পারিত, না করিতেও পারিত। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,—কোন কার্য্যের জন্য দায়ী হইতে হইলে, সেই কার্য্যকর্ত্তার স্বাধীনতা থাকা চাই।

তুমি চাও যে সেই হত্যাকারী ধৃত হয় এবং ধৃত হইয়া বিচারার্থ রাজপুরুষদিগের নিকট সমর্পিত হয়, উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত হয়; এবং সে দণ্ডিত হইলেই তুমি সন্তুষ্ট হও। এ কি তোমার কল্পনার ও হৃদয়ের একটা খামখেয়ালী চেষ্টা মাত্র?—না, তাহা নহে। তুমি শান্তই থাক, কিংবা ঘৃণা ও রোষে উত্তেজিতই হও, সেই হত্যাকাণ্ডের সময়েই হউক কিংবা বহুকাল পরেই হউক, প্রতিশোধ লইবার কোন ব্যক্তিগত ভাব তোমার মনে থাকিতে পারে না, কেন না তোমার উহাতে লেশমাত্র স্বার্থ নাই,—তথাপি তুমি চাও যে সেই হত্যাকারী দণ্ডিত হয়। দণ্ডিত না হইয়া প্রত্যুত যদি সেই অপরাধী ব্যক্তি তাহার সেই পাপকার্য্যের দরুণ কোন প্রকার সৌভাগ্য লাভ করে, তুমি তখন আবার এই কথা নিশ্চয় বল যে, সৌভাগ্য লাভ করা দূরে থাক্, তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তার কষ্ট পাওয়া উচিত; তুমি তাহার সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর, তুমি তখন কোন এক উচ্চতর ন্যায়বিচারের দোহাই দেও। এই যে তোমার বিচার-

ক্রিয়া, তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে পাপ-পুণ্য-ঘটিত বিচার বলিয়া থাকেন। ইহাতে এইরূপ বুঝায় যে, ধর্ম্মের পুরস্কার সুখ ও অধর্ম্মের দণ্ড দুঃখ—এইরূপ একটি দুর্লঙ্ঘ্য উচ্চতর নিয়ম আছে বলিয়া মানুষ বিশ্বাস করে। এই নিয়মের ধারণাটি মানুষের মন হইতে উঠাইয়া লইলে, পাপপুণ্য বিচারের কোন ভিত্তি থাকে না; এই বিচারক্রিয়া অপসারিত করিলে, সৌভাগ্যবান অপরাধীর প্রতি ঘৃণা ও রোষের ভাব দুর্ব্বোধ্য—এমন কি অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন কাহাকে কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখিলে, সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহাকে দণ্ডিত করা যে আবশ্যক—এ কথা তোমার মনেও আসে না।

অতএব, নৈতিক ব্যাপারের সমুদায় অংশ গুলি এইরূপভাবে অবস্থিত:—তৎসংক্রান্ত সমস্ত তথ্যগুলিই সুনিশ্চিত; উহার একটি তথ্যকে যদি টলাইয়া দেও,—সমস্ত নৈতিক ব্যাপারটাই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। অতি সামান্য পর্য্যবেক্ষণেই এই সকল তথ্য সপ্রমাণ হয় এবং উহাদের বন্ধনসূত্র সহজেই আবিষ্কৃত হইতে পারে—তজ্জন্য সূক্ষ্মতম যুক্তির প্রয়োজন হয় না। হয়, হৃদয়ের ভাবগুলিকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে হয়, নয় স্বীকার করিতে হয়,—ভাবগুলির মধ্যে একটা বিচার-ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন আছে; আবার ঐ বিচার-ক্রিয়ার মধ্যেই ভালমন্দের পার্থক্য জ্ঞান নিহিত আছে; এই পার্থক্য জ্ঞান হইতেই একটা অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাব আসিয়া পড়ে, এবং এই অবশ্যকর্ত্তব্যতা এরূপ কার্য্যকর্ত্তার প্রতিই প্রযুক্ত হয় যে বুদ্ধিমান ও স্বাধীন; পরিশেষে পাপপুণ্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে—যাহা ভালমন্দের পার্থক্যেরই অনুরূপ—সেই পার্থক্যের মধ্যে এই মূলতত্ত্বটিকেও স্বীকার করিতে হয় যে, ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য আছে। (ক্রমশঃ)

—

নূতন গ্রহের সন্ধান।

গ্রহনক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণে বড় বড় দুরবীক্ষণযন্ত্রের সহিত ফোটোগ্রাফের ছবি উঠাইবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, গত ষাট বৎসরের মধ্যে অনেক যুগলনক্ষত্র নিহারিকাপুঞ্জ এবং নূতন তারকার আবিষ্কার হইয়াছে। তা' ছাড়া সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ধূমকেতুর গতিবিধি সম্বন্ধেও অনেক নব নব তথ্য ঐ উপায়ে সংগ্রহ করা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যে সৌরজগতের অধিবাসী, এই সুদীর্ঘকালে তাহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য নূতন তত্ত্বই আবিষ্কৃত হয় নাই। মঙ্গল (Mars) এবং পৃথিবীর কক্ষার মধ্যে যে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র গ্রহ (Asteroids) পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদেরি দুই চারিটির আবিষ্কারের কথা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইয়াছি বটে, কিন্তু এগুলিকে কখনই বৃহৎ আবিষ্কার বলা যায় না। সম্প্রতি পিকারিং (Pickering) ও পেরিন্ (Perrine) সাহেব ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আকাশের চিত্র অঙ্কন করিয়া শনি ও বৃহস্পতিগ্রহের যে কয়েকটি নূতন উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছেন, কেবল তাহাকেই আধুনিক যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বলা যাইতে পারে।

আকাশের যে অংশটি অধিকার করিয়া সূর্য্যের পরিবার বাস করিতেছে, তাহা অনন্ত মহাকাশের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকট তাহা অতি বৃহৎ। এই ক্ষুদ্র সৌরজগতের গূঢ় রহস্যগুলিকে মানুষ যে কোন কালে নিঃশেষে

আবিষ্কার করিতে পারিবে তাহার আশা করা যায় না। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা দেশের জ্যোতিষিগণ নানা প্রকারে সৌরজগতের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আজও ইহার বড় বড় জ্যোতিষ্কগুলিকেও নিঃশেষে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি এবং শনি এই ছয়টি মাত্র গ্রহের অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এগুলি ছাড়া আরো যে বৃহৎ গ্রহ সৌরজগতে থাকিতে পারে, একথা সেই সময়ে তাঁহাদের মনেই আসে নাই। হার্শেল এবং লেভেরিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক ইউরানস্ (Uranus) ও নেপ্চুন্ (Neptune) গ্রহদ্বয়ের আবিষ্কারের পর প্রাচীন জ্যোতিবের্ত্তাদিগের জ্যোতিষিক জ্ঞান যে কত সংকীর্ণ ছিল, তাহা সকলে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন।

গত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নেপ্চুন্ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সৌরজগতে আর কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শত শত বৃহৎ দূরবীনের অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে কোন বৃহৎ গ্রহ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না ভাবিয়া জ্যোতির্বিদ্গণও একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইউরানস্ গ্রহকে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে ঈষৎ বিচলিত হইতে দেখিয়া, ইংরাজ জ্যোতিষী আডামস্ (Adams) ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভেরিয়ার কেবল গণিতের সাহায্যে যেমন নেপ্চুনের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন আবার ঠিক্ সেইপ্রকার গণনায় আর কয়েকটি বৃহৎ গ্রহের আবিষ্কার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই নবগ্রহগুলির আবিষ্কার বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমাদের পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির মধ্যে নেপ্চুনই সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী। জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহার কক্ষার বাহিরে সৌরপরিবারভুক্ত কোন জ্যোতিষ্কেরই সন্ধান পান নাই। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল অধ্যাপক টড্ (Prof. Todd) ইউরেনাস্ গ্রহের গতিবিধি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নেপ্চুনের আকর্ষণে ইহার ভ্রমণপথের যে বিচলন হয়, তাহা হিসাবের মধ্যে আনিয়াও গণনালব্ধ পথের সহিত উহার প্রত্যক্ষদৃষ্টপথের মোটেই একতা দেখা যায় নাই। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নেপ্চুনের কক্ষার বাহিরে নিশ্চয় একটি বৃহৎ গ্রহ আছে বলিয়া টড্ সাহেবের মনে হইয়াছিল। আমেরিকার ওয়াসিংটন্ মানমন্দিরের বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা তিনি কিছু দিন ধরিয়া নবগ্রহটির অন্বেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রহের কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই, এবং গণনায় ভুল আছে ভাবিয়া এই অনুসন্ধানে অপর কোন জ্যোতিষী যোগদান করেন নাই। কাজেই টড্ সাহেবের গণনা বৃত্তান্তটি আধুনিক জ্যোতিষিক ইতিহাসে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই।

সম্প্রতি অধ্যাপক ফর্বিস্ (G. Forbes) সাহেব টড্ সাহেবের সেই পুরাতন হিসাব পরীক্ষা করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত দেখিতে পাইয়াছেন, এবং নূতন গ্রহের খোঁজে নেপ্চুনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদিগকে আহ্বান করিতেছেন। কেবল সেই প্রাচীন গণনার উপর নির্ভর করিয়া ফর্বিস্ সাহেব আমন্ত্রণবাণী প্রচার করেন নাই। গাণিতিক প্রমাণ ব্যতীত নূতন গ্রহের অস্তিত্বের ইনি আরো অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

ফর্বিস্ সাহেবের প্রমাণগুলি বুঝিতে হইলে ধূমকেতু সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। সৌরজগতের নানা জ্যোতিষ্কের মধ্যে ধূমকেতুগুলিই তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল গতিবিধির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। কখন কোন্ গ্রহ উপগ্রহের আকর্ষণে তাহাদের ভ্রমণপথ কতটা পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার হিসাব বড়ই কঠিন। তথাপি সূর্য্য এবং বৃহস্পতি ইত্যাদি বৃহৎ গ্রহগণের আকর্ষণে যে সকল ধূমকেতু চিরদিনের জন্য সৌরজগতে বন্দী হইয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের গতিবিধির মধ্যে একটা মোটামুটি শৃঙ্খলা দেখা যায়। ইহারা পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহের ন্যায়ই এক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করে। কিন্তু ভ্রমণপথে হঠাৎ কোন বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকল নিয়মই ভঙ্গ হইয়া যায়। তখন পূর্ব্বের ভ্রমণপথ ত্যাগ করিয়া ঐ সকল প্রবল গ্রহের নিকটবর্ত্তী এক এক নূতন পথে ইহারা চলিতে আরম্ভ করে। প্রবল গ্রহের নিকট দুর্ব্বল ধূমকেতুগুলির এইপ্রকার আনুগত্য-স্বীকার জ্যোতিষিক ইতিহাসের দুর্লভ ঘটনা নয়।

জ্যোতির্বিদ্‌গণ বলেন, মহাকাশের নানা অংশে যে সকল উল্কাপিণ্ডময় ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক দলে দলে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাই সূর্য্যের আকর্ষণের সীমার ভিতরে আসিয়া পড়িলে ধূমকেতুর আকার পরিগ্রহ করে। এই অবস্থায় তাহারা আর গন্তব্য স্থানের দিকে চলিতে পারে না। সূর্য্য তাহাদিগকে মহাপুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতুতে রূপান্তরিত করিয়া এক এক অনুবৃত্তাকার (Parabolic) পথে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতে আরম্ভ করে।

এই প্রকারে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ধূমকেতুগুলি যখন সৌরজগৎ ত্যাগ করিবার জন্য পিছাইতে আরম্ভ করে, তখনই ইহাদের প্রকৃত সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যদি তাহার আকর্ষণে ইহাদের গতি হ্রাস হইয়া পড়ে, তবে কেহই নিস্তার পায় না। চিরদিনের জন্য সৌরজগতে বন্দী হইয়া ধূমকেতুগুলিকে সেই আকর্ষক গ্রহের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। গতি বৃদ্ধি পাইলে ইহারা হাইপারবোলা (Hyperbola) আকারের পথ অবলম্বন করিয়া চিরদিনের জন্য সৌরজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। বহুদিন হইল লেক্‌সেলের ধূমকেতুটিতে (Lexell's Comet of 1770) গতিবৃদ্ধির কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল। এই জ্যোতিষ্কটি সৌরজগতে বন্দী হইয়া বৃত্তাভাস পথে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছিল। তা'র পর হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার গতি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সেই দিন হইতে লেক্‌সেলের ধূমকেতুর আর সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। কেবল গতিবৃদ্ধির জন্য হাইপারবোলা পথ অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া জ্যোতির্বিদ্‌গণ অনুমান করিতেছেন।

ধূমকেতু সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি যে কাল্পনিক নয়, তাহার শত শত প্রমাণ আছে। বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রহের ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে বৃহৎ ধূমকেতুগুলির কক্ষাকে ঐসকল স্থানে আসিয়া শেষ হইতে দেখা যায়। এন্‌কি (Encke) ব্ররসেন্ (Brorsen) প্রভৃতি ধূমকেতুগুলি বৃহস্পতির নিকট দিয়াই পরিভ্রমণ করে। হ্যালি* (Halley), অল্‌বার

* এই বৃহৎ ধূমকেতুটি এই বৎসর শীতের শেষে দেখা দিবে। ইহার প্রদক্ষিণকাল ৭৬ বৎসরের কিছু অধিক। গত ১৮৩৫ সালে ইহার শেষ উদয় দেখা গিয়াছিল।

(Alber) এবং পনের (Pon) ধূমকেতুগুলি নেপ্‌চুনগ্রহের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। সুবিখ্যাত টেম্‌পেলের ধূমকেতু (Tempel's Comet) সহিত আরো দুইটি ধূমকেতু মিলিয়া সেই প্রকার ইউরেনাসের সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহে না। প্রধান গ্রহগুলির সহিত ধূমকেতুদিগের এইপ্রকার ঘনিষ্ঠতা দেখিলে, গ্রহেরাই যে ধূমকেতুগুলিকে নিজেদের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

গত ১৮৪৩, ১৮৮০, এবং ১৮৮২সালে যে তিনটি ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, তাহাদের গতিবিধি গণনা করিতে গিয়া অধ্যাপক ফর্বিস্ সাহেব গণনার ফলে এক অত্যাশ্চর্য্য একতা দেখিয়াছিলেন। ভ্রমণ-পথ গণনা করা হইলে, তাহাদের প্রত্যেকেরই কক্ষাকে নেপ্‌চ্যুন্ গ্রহের বাহিরে একটি স্থানে মিলিত হইতে দেখা গিয়াছিল, এবং অনুসন্ধানে আরো সাতটি ক্ষুদ্র ধূমকেতুর পথ ঐ প্রদেশে শেষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ না থাকিলে একই প্রদেশে বহু ধূমকেতুর কক্ষার এই প্রকার মিলন একবারে অসম্ভব। টড্ সাহেবের গাণিতিক প্রমাণের সহিত এই প্রমাণটি যোগ করিয়া ফর্বিস্ সাহেব নেপ্‌চুনের কক্ষার বাহিরে নিশ্চয়ই একটি বৃহৎ গ্রহ আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

আবিষ্কর্ত্তা তাঁহার গণনালব্ধ গ্রহটির অস্তিত্ব সমাচার প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ইহার সূর্য্যপ্রদক্ষিণকাল এবং দূরত্বাদিও গণনা করিয়াছেন। এই হিসাব হইতে দেখা যায়, আমাদের পৃথিবী সূর্য্য হইতে যতদূর অবস্থিত, তাহারিপ্রায় ১০৫ গুণ দূরে থাকিয়া নূতন গ্রহটি হাজার বৎসরে এক একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রায় নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। নূতন গ্রহটি যে কতদূরে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে এখন পাঠক অনুমান করুন।

জ্যোতির্বিদ্‌গণ বলিতেছেন, সূর্য্য হইতে এত দূরবর্ত্তী বলিয়াই এপর্য্যন্ত গ্রহটি দূরবীনে ধরা দেয় নাই। পর্য্যবেক্ষকগণ সম্ভবতঃ ইহাকে একটি ক্ষীণ নক্ষত্র ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

মঙ্গল বৃহস্পতি প্রভৃতি পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির কক্ষা পৃথিবীর কক্ষার সহিত প্রায় এক সমতলে অবস্থিত। কেবল বুধ শুক্র এবং শনির কক্ষাকে ধরাকক্ষার তল হইতে কিঞ্চিৎ অধিক বাঁকিয়া থাকিতে দেখা যায়। কাজেই মেষ বৃষাদি নক্ষত্রপুঞ্জযুক্ত রাশিচক্রের মধ্যেই সৌরজগতের জ্যোতিষ্কগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়া থাকে। এই কারণে গ্রহ উপগ্রহের সন্ধানের জন্য জ্যোতিষীরা এপর্য্যন্ত রাশিচক্রের মধ্যেই তাঁহাদের দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নূতন গ্রহের ভ্রমণপথ ধরাকক্ষের তলের সহিত প্রায় ৫২ অংশ কোণ্ উৎপন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছে। সুতরাং রাশিচক্রের বহির্ভূত প্রদেশেই ইহাকে অধিকাংশকাল কাটাইতে হয়। নূতন গ্রহটির এই বিশেষত্বটিই ইহাকে শত শত দূরবীনের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে বলিয়াও অনেকে অনুমান করিতেছেন।

ফর্বিস্ সাহেব সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রচারিত হইলে, আমেরিকা হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত পিকারিং (Prof. Pickering) সাহেব ফোটোগ্রাফ চিত্রে নেপ্‌চুন্ হইতেও দূরবর্ত্তী একটি গ্রহের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন। এই আবিষ্কার

সমাচার প্রচার হইলে, ফর্বিসের গ্রহই পিকারিঙের চিত্রে ধরা দিয়াছে বলিয়া জ্যোতির্বিদ্‌গণ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পিকারিং সাহেব তাঁহার গ্রহের অবস্থানাদি সম্বন্ধে যে বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে উহা যে ফর্বিসের গ্রহ নয় তাহা বেশ বুঝা যায়। আবিষ্কর্ত্তার গণনা অনুসারে এই দ্বিতীয় নূতন গ্রহটি এখন (বৈশাখ মাসে) মিথুনরাশিতে একটি ক্ষীণ নক্ষত্রের আকারে অবস্থান করিতেছে।

যাহা হউক, আকাশের যে প্রদেশ গ্রহবর্জ্জিত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, সেই স্থানেই একই সময়ে দুইটি বৃহৎ গ্রহের অস্তিত্বের আভাস পাইয়া, জ্যোতির্বিদ্‌গণ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। ষাট বৎসর পূর্ব্বে আডামস্ এবং লেভেরিয়ার নেপ্‌চুন্ গ্রহের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রচার করিলে, সমগ্র বৈজ্ঞানিকজগতে যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, দুইটি নূতন গ্রহের আবিষ্কার সম্ভাবনায় আজ ঠিক সেই প্রকার আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। জগতের প্রধান প্রধান মানমন্দিরের জ্যোতিষিগণ গ্রহ দুইটিকে দেখিবার জন্য নানা আয়োজন করিতেছেন। ১৮৪৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের ন্যায় ১৯০৯ সালের কোন একদিন হয় তো জ্যোতিষিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে।

অতিদূরবর্ত্তী গ্রহগুলির সন্ধান করা যেমন দুঃসাধ্য, সূর্য্যের অতি নিকটস্থ গ্রহের অন্বেষণ তেমনি কষ্টকর। আমাদের পরিজ্ঞাত জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে এখন বুধ গ্রহটিই (Mercury) সূর্য্যের নিকটতম বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিকট হইলেও এটি সূর্য্য হইতে প্রায় তিন কোটি ষাট্ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। বহুদিন হইল নেপ্‌চ্যুন্ গ্রহের আবিষ্কারক লেভেরিয়ার সাহেব বুধগ্রহের গতিবিধি লইয়া কিছুকাল পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া তাহার সুস্পষ্ট বিচলন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নিকটে অপর আর একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্ক না থাকিলে কোন গ্রহেরই বিচলন হয়। কাজেই সূর্য্যের আরো নিকটবর্ত্তী প্রদেশে থাকিয়া কোন একটি অপরিচিত গ্রহ বুধকে টানিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। কিন্তু লেভেরিয়ার সাহেব বহু পর্য্যবেক্ষণেও সেই অপরিচিতটিকে চাক্ষুষ দেখিতে পান নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ১৮৫৯ সালে ডাক্তার লেস্‌কারবল্ট (Dr. Lescarbault) নামক জনৈক অজ্ঞাতনামা বৈজ্ঞানিক সূর্য্যবিম্বের উপর দিয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রহকে যাইতে দেখিয়াছিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে লেভেরিয়ার সাহেব আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। ডাক্তার লেস্‌কারবল্টের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, এবং সূর্য্যবিম্বে দৃষ্ট গ্রহসম্বন্ধে সকল ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইয়া গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রহের আকর্ষণেই যে বুধ তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, গণনার ফল দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। লেভেরিয়ার সাহেব ইহার কক্ষাদি নিরূপণ করিয়া ইহাকে ভল্‌কান্ (Vulcan) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ডাক্তার লেস্‌কারবল্ট ব্যতীত অপর কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ অদ্যাপি ভল্‌কান্ গ্রহকে দেখিতে পান নাই। বুধ এবং সূর্য্যের মধ্যস্থিত আকাশে কোন জ্যোতিষ্ক আছে কি না, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করিবার জন্য অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ অনেক পর্য্য-

বেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই কৃতকার্য্য হন নাই।

সূর্য্যের প্রখর আলোক তাহার নিকটস্থ জ্যোতিষ্কগুলিকে বড়ই অস্পষ্ট করিয়া রাখে। কেবল এই কারণে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্কের পর্য্যবেক্ষণ বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় উজ্জ্বল সূর্য্যবিম্ব যখন কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর এই অসুবিধাটি থাকে না। লেভেরিয়ারের সময় হইতে এপর্য্যন্ত অনেক পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক গ্রহণেই ভলকান্ গ্রহের সন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু কোন জ্যোতিষীই তাহাকে আর দেখিতে পান নাই। ১৮৭৪ সালের সূর্য্যগ্রহণে অধ্যাপক ওয়াটসন্ এবং সুইফ্‌ট সাহেব সূর্য্যের অতি নিকটে দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখিয়া, তাহাদেরি একটিকে ভলকান্ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সেই দুটিকেই কর্কটরাশির দুইটি নক্ষত্র বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

বৃহৎ আবিষ্কার মাত্রই অতর্কিতভাবে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কোন্ দিন কোন্ উপলক্ষে বিধাতার অনন্ত সৃষ্টির কোন্ কণাটুকুর পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্বে হিসাব করিয়া বলা যায় না। সুতরাং লেভেরিয়ারের ভল্‌কান্‌গ্রহটি যে, কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে হঠাৎ দেখা দিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবে না, একথা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না।

মহর্ষির জন্মতিথি।

(৩রা জ্যৈষ্ঠ)

আজ মহর্ষির শুভ জন্মদিন উপলক্ষে যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি "যে মহাপুরুষের মৃত্যু নাই। তাঁহারা যখন দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তখন আমাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা যে জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সে কার্য্য শেষ হয় না; যাহা কিছু অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, মৃত্যুর পরে তাহা সম্পূর্ণ হয়। শুভক্ষণে তাঁহাদের জন্ম তাঁহাদের জীবন মনুষ্যের হিতসাধনে অতিবাহিত হয়, মরণও জীবের কল্যাণজনন। মরণে তাঁহাদের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয় না; তাঁহাদের জীবনের অমূল্য দৃষ্টান্ত, তাঁহাদের অকথিত বাণী, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি পরবর্ত্তী যাত্রীদিগের পথের সম্বল হয়।"

অমৃত নিকেতনের যাত্রী যে আমরা, আমাদের লক্ষ্য যে সুদূর, পথে বিঘ্ন বিপত্তি রাশি রাশি। আমরা এই জীবন সংগ্রামে পিপাসায় প্রাণান্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ি। তাই ভগবানের দূত আসিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করেন, মৃত প্রাণকে সজীব করেন, নিরুৎসাহকে উৎসাহ দান করেন, বিপন্নকে উদ্ধার করেন। তাঁহার পরশে যে দুর্ব্বল সে সবল হয়, যে ভীরু সে সাহস পায়, হতাশ বিমর্ষ চিত্তেও আশার সঞ্চার হয়। এই সকল মহাত্মারা মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুর পরেও অলক্ষিত ভাবে তাঁহারা কার্য্য করিতে থাকেন।

এই কয়েক বৎসর হইল আমাদের পিতৃদেব যে আমাদের ছাড়িয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন, তিনি কি সত্য সত্যই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? না তাহা নহে। সত্য বটে, আমরা তাঁহাকে চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাই না, তাঁহার মধুর বাণী শুনিতে পাই না কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি কি আমাদের সঙ্গে নাই? আছেন, তাঁহার শরীর নাই কিন্তু তাঁহার আধ্যা-

ত্মিক জীবন তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল শিক্ষা দিয়াছেন—যে সকল পবিত্র ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিনিধি। তোমরা যদি তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতে চাও, তাহ'লে তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখ—জীবনে পরিণত কর। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তে তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ কর—তাঁহার উপদেশ মত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে ব্রতী হও। এই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন।

তাঁহা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইয়াছি একটুকু প্রণিধান করিয়া দেখ। দেখিবে যে বিষয়মার্গ হইতে আধাত্মিক রাজ্যে আমাদের আত্মাকে উন্নীত করা, ইহাই তাঁহার সমস্ত উপদেশের সার মর্ম্ম।

আমরা যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখি তখন কি দেখি? এই যে ধর্ম্ম কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াতে পরিণত; গেরুয়া বসন, ভস্মলেপন, উপবাস, গঙ্গাস্নান, তীর্থযাত্রা, এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানকে লোকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। আর দেখি যে অনন্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরের মূর্ত্তি গড়িয়া লোকেরা পরিমিত ভাবে তাঁহার পূজা করিতেছে। মহর্ষির উপদেশের মাহাত্ম্য এই যে তিনি ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ জানিয়াছি যে ধর্ম্ম কেবল বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড নহে। ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু, এমন খাঁটি জিনিস যে তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা যায়, আত্মবিসর্জ্জন করা যায়। তিনি জীবনে দেখাইলেন যে

"ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ত্বমানশুঃ"।

না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা কিন্তু এক ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্বকে ভোগ করা যায়। ধর্ম্মের পরীক্ষা ত্যাগে। এক সময়ে যখন আমাদের সাংসারিক অবস্থা ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া ঘোর সঙ্কটাকীর্ণ হইয়াছিল, পাওনাদারেরা আসিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত, তখন তিনি সকলি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন, বলিলেন যে গায়ে এক খণ্ড পরিধান বস্ত্র থাকিতে, হাতে একটি কাণা কড়ি থাকিতে কোর্টে গিয়া 'আমার কিছুই নাই,' একথা বলিতে পারিব না। তখন তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া পরমধন লাভ করিলেন।

ঋণ পরিশোধে সর্ব্বসম্পত্তি বিসর্জন রূপ বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর তিনি যে অপার শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিলেন তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে এইরূপে বর্ণিত আছে—

"আমি যা চাই তাই হইল—বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয় ও নাই, বেস মিলে গেল।

"সেই অভিলাষে বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক—যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া ধনধান্য জ্বলিয়া যায় তবে সে বড় আশ্চর্য্য নহে।"

আমি বলি যে "হে ঈশ্বর আমি তোমা ছাড়া আর কিছুই চাই না।" তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন।

"চুগড়ী কি ঠুজ্জিয়া মরেস্সর নহী কে চিবাকে পানি পিয়ুঁ"।

যাহা প্রার্থনাতে ছিল তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল। সে শ্মশানের সেই এক দিন, অদ্যকার এই আর একদিন। আমি আরএক সোপানে উঠিলাম। চাক-

রের ভীড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম, ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। "হে ঈশ্বর অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল —এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।"

(জীবনী ৮৮)

তাঁহার নিকট হইতে আমরা আর কি পাইয়াছি? না,

ব্রহ্ম পূজা।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা ভাঙ্গা সহজ কিন্তু নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই কঠিন। উপদেবতার আসনে অমূর্ত্ত ঈশ্বরের স্থাপনা এবং জাগ্রত জীবন্ত দেবতারূপে তাঁহার আরাধনা এ বড় কঠিন সমস্যা। এই সমস্যা তিনি যথাসাধ্য পূরণ করিলেন। যখন তিনি দেখিতেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা ধূপ ধুনা নৈবেদ্য দিয়া কৃত্রিম দেব দেবীর উপাসনা করিতেছে তখন তিনি আন্তরিক ব্যথা পাইতেন, মনে করিতেন কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব—এই স্পৃহা তখন তাঁহার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল। পরে যখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিতে পাইলেন এবং সেই অমৃত পুরুষ যখন তাঁহাকে অন্তরে দর্শন দিলেন—যখন জগন্মন্দিরের দেবতা তাঁহার হৃদয়মন্দিরের দেবতা হইলেন, তখন তিনি আশাতীত ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রেমরবির অভ্যুদয়ে তাঁহার বিষাদ অন্ধকার চলিয়া গেল—তাঁহার চিরনিদ্রা ভঙ্গ হইল। জীবন স্রোত বেগে চলিল—তিনি প্রাণে বল পাইলেন।

যখন পৌত্তলিক পূজায় তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল এবং তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন—সেই সময়ে দৈব ঘটনায় কিরূপে উপনিষদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তাহা তোমরা তাঁহার জীবনীতে পড়িয়া থাকিবে। ঘটনাটি এই;—তিনি বলিতেছেন

"আমার এই ভ্রম হইল যে আমাদের সমুদয় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব। আমার মনের যখন এই প্রকার নিরাশ ভাব তখন হঠাৎ একদিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা আমার সম্মুখে দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। ঔৎসুক্যবশতঃ তাহা ধরিলাম কিন্তু তাহাতে যাহা লেখা আছে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন, সেই পাতা তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহাকে বলিলাম, এই পাতার শ্লোকগুলার অর্থ করিয়া রাখ, কুটী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়া দিবে, এই বলিয়া আমার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। অবশেষে ব্রহ্মসভার পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাহার অর্থ করিয়া দিলেন। তিনি পাতা পড়িয়া বলিলেন এ

যে ঈশোপনিষদ—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—

পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আচ্ছাদিত রহিয়াছে—এই মহাবাক্যে যেন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিল। সেই দৈববাণী তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুবিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যেমন ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন, উপনিষদের এই বচনে তাহার সম্পূর্ণ সায় পাইয়া পুলকিত হইলেন। তিনি যাহা চান তাহাই দৈবানুগ্রহে তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল।

আমাদের সাধারণ লোকের এক সংস্কার এই যে, সংসারে থাকিলে ধর্ম্মসাধন হয় না—ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা আবশ্যক। ঋষিরা বনে গিয়াই ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা আরাধনা করিতেন। উপনিষদ কেবল অরণ্যে বসিয়াই পড়িতে হইবে এই রূপ বিধান, এই জন্য উপনিষদের প্রথম কল্প আরণ্যক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমাদের এ কালের অবস্থা অন্যতর। গৃহাশ্রমে আমাদের বাস, গৃহই আমাদের তপোবন।

"গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।"

গৃহেতেও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ রূপ তপস্যা করা যায়। উপনিষদে একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা কেবল অরণ্যে অরণ্যে হইত,মহর্ষির বিধানে সেই উপাসনা গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি বলিয়া দিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম। গৃহে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। পিতামাতাকে সেবা করিতে হইবে, স্ত্রী পুত্রকে পালন করিতে হইবে, স্বজন বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিতে হইবে। ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা লোকহিত ব্রত উদ্যাপন করিতে হইবে। সন্ন্যাস অবলম্বন না করিয়া পরিবারের মধ্যে অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা করা, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নব বিধান।

ঈশ্বরের উপাসনা কি? মহর্ষির হৃদয়প্রসূত ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ হইতে আমরা এই মহামন্ত্র শিক্ষা করিয়াছি যে,

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার আদিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ব্রহ্মপ্রীতি একদিকে, কর্ত্তব্য আর একদিকে—এই উভয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে। ধর্ম্মকে যদি দেহরূপে কল্পনা করা যায়, তবে তাহার অস্থি হচ্ছে কর্ত্তব্য নিষ্ঠা এবং তাহার রক্ত মাংস হচ্ছে প্রীতি। এই উভয়ের মিলন জীবনে। আমরা যাঁহার প্রসাদে মূর্ত্তিপূজার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মপূজা পাইয়াছি এবং সেই পূজার প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়াছি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার স্মৃতি কি হৃদয়ে পোষণ করিব না?

মহর্ষি যখন জানিলেন যে তাঁহার উপাস্য দেবতা যিনি, তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার অনন্ত-স্বরূপ, তখন তিনি উপদেবতাদের পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকেই ধরিয়া রহিলেন, তাঁহার অন্তরের বিশ্বাসকে অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তাহার ফল যে গৃহবিচ্ছেদ বৈষয়িক ক্ষতি প্রসূত হইল, তাহা কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন—ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।"

তিনি ব্রহ্মলাভের জন্য কত সাধনা,

কি কঠোর তপস্যায় জীবন যাপন করিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার অভিলষিত বস্তু আপনি পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি নিজে যে প্রেমামৃত পানে মত্ত ছিলেন আর সকলকে সেই অমৃতরস আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল—তিনি হিমালয়ের আশ্রম হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সত্য লোক-সমাজে প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তিনি তাঁহার আত্ম-সাধনার ফল আমাদের সকলের মধ্যে বিতরণ করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অমৃত-ফল ভক্ষণ করিয়া আমরা নব জীবন লাভ করিয়াছি। তাঁহারই উপদেশে আমরা জানিলাম যে পার্থিব অন্নপানেই আমাদের পোষণ হয় না, আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য অধ্যাত্মিক অন্ন পানের প্রয়োজন। তিনিই দেখাইয়া দিলেন যে ভূমাতেই আমাদের সুখ—সেই অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মই আমাদের উপাস্য দেবতা। অনন্তের সঙ্গে যে যোগ তাহা এখানেই আরম্ভ হয়, সে যোগের আর অন্ত নাই। সেই অধ্যাত্মযোগ নিবদ্ধ করিতে পারিলে এই মৃত্যুময় সংসারে আমরা অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। পরকালে বিশ্বাস যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করে না। বিত্তমোহে মুগ্ধ প্রমাদী অবিবেকীর নিকট পরকাল-তত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। সেই সাধক তাহা প্রত্যক্ষবৎ গ্রহণ করিতে পারেন যিনি পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য সাধন করিতে থাকেন। অনন্তের সহবাসে অনন্ত জীবনে বিশ্বাস ভক্ত-হৃদয়ে অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হে মুমুক্ষু ভক্তগণ, যদি তোমাদের মনে পরকালের প্রকাশ সংশয়-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তোমরা মহর্ষির আশ্বাসবাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হও। তাঁহার উপদেশ এই যে মানবাত্মা অনন্ত উন্নতির অধিকারী। এখানে যে সাধক ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ থাকিয়া, সহিষ্ণু হইয়া, তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য সকল সাধন করিতে থাকে, "সে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সংসারের পার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অন্তরতম অমৃত ব্রহ্মের তিমিরাতীত জ্ঞানোজ্জ্বল প্রেমসিক্ত ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানে নূতন প্রাণ পাইয়া, পবিত্র হইয়া তাঁহার কৃপাতে সে জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে, সেই অনন্ত জ্ঞান, প্রেম আনন্দের সহিত ছায়া ও আতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত থাকে। সে দিনের আর অবসান হয় না। "সকৃৎ বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।"

পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,
নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত আকাশে।
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি,
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে, নবসুখ, নবপ্রাণ,
নব দিবা আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে,
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয় মুখে
চলে যাব গান গাহি কে রহিবে আর দূর পরবাসে।"

নাম-মাহাত্ম্য।

আজ নববর্ষের প্রথম দিন—আজ আমাদের মহোৎসব। এতদিন অপেক্ষা করিয়া আজ আবার সেই দিন আসিয়াছে, যে দিনে আমাদের মাকে সকলে মিলিয়া বরণ করিয়া নিজ নিজ হৃদয় মন্দিরে তুলিয়া লইব। মাত! তোমাকে নববর্ষের প্রীতি উপহার দিবার জন্য আজ আমরা সকলে এখানে সমবেত হই-

য়াছি। আজ আমাদের সেই দিন আসিয়াছে, যাহার জন্য চাতক পক্ষীর ন্যায় এই সারাটী বৎসর অপেক্ষা করিতেছিলাম কবে তোমার নামে আনন্দ কোলাহল করিয়া সকলে মিলিব এবং তোমার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ হইবে। আজ আমাদের সেই দিন আসিয়াছে যে দিনে সকলে মিলিয়া উচ্চৈস্বরে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে পাইব এবং সন্তানদিগের ক্রন্দনে তুমি প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। এই শুভদিনে আমরা কত না আশা করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, যে কত সমাদরে, কত ভক্তি-ভাবে নিজ নিজ হৃদয়ে বসাইব, তোমার কত নাম দিব, কত নামে তোমাকে ডাকিব; তোমার নামের মাহাত্ম্য কি, জগতে তাহা দেখাইব।

আমাদের আত্মা সেই পবিত্র স্বরূপের নামে আজ পবিত্র হউক, পরমাত্মার মহিমায় এমন ভাবে আচ্ছাদিত হউক যাহাতে কোনরূপে পাপের কণামাত্রও প্রবেশ করিতে না পারে। হে ভাই বন্ধুগণ! আমরা তাঁহাকে আজ নামের দ্বারা অর্চ্চনা করিব বলিয়া আসিয়াছি। দেবতার চরণে যেমন ফুল রাখিয়া লোকে পূজা করে তেমনি নামের দ্বারা হৃদয়ে তাঁহার পূজা করি আইস। তাঁহার পবিত্র নামে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর। আমাদের হৃদয়ে ভক্তি ভাবের উদ্রেক হউক, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার আবির্ভাব হইবে। আমরা তখন নামের পুষ্প দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিব। ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্রীতি উচ্ছ্বাসে আমরা কত নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিব। সেই হৃদয়ের মণিকে কত কষ্টে খুজিয়া পাইয়াছি, আর তাঁহাকে কিছুতেই যেন না হারাই। আমাদের হারাধন, এমন ধন আমরা পাইয়াছি, এত দুর্লভ, যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুদ্রা খরচ করিলেও তাহা পাওয়া যায় না। কেবল তাঁহার অনুগ্রহেই আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছি। তিনি আমাদের মধ্যস্থলে হৃদয়াসনে আসীন। তাঁহার আকর্ষণ আমাদের ছাড়াইবার যো নাই। ইহাই তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও মহাপ্রসাদ। আমাদের আত্মার দ্বারা সকলে পরমাত্মাকে ঘিরিয়া বসি আইস। এখন অতি পবিত্র ভাবে এই হৃদয়-মণিকে হৃদয়কোষে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদা নিষ্কলঙ্ক ভাবে এমন পাপ শূন্য হইয়া চলিতে হইবে যাহাতে পাপে তাপে জড়িত হইয়া মোহে অন্ধকারে হৃদয়ের মণিকে হারাইয়া না ফেলি। একবার যে ধন পাইয়াছি, হরাইলে যদি বা না ফিরে —হয়ত বা যুগ যুগান্তরের কঠোর তপস্যায়, কঠোর সাধ্য সাধনায় তাহা না পাইতে পারি।

আমাদের হৃদয়পটে তাঁহার জাজ্জ্বল্যমান ছবি যেন চিরদিন অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারি। তাঁহার ছবি যেন সর্ব্বদা আত্মায় ধারণ করিয়া চলি। তিনি আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের জীবন বৃথা হইবে তাঁহার অভাবে যে আমরা নিরাশ্রয় হইব। তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে যেন আমরা যত্নবান হই, যাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তান হইয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারি। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিলে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তিনি আমাদের নেতা হইয়া যেদিকে লইয়া যাইবেন আমরা যেন সেইদিকে যাইতে প্রবৃত্ত হই। এই পৃথিবীতে পথভ্রমে কুপথগামী হইয়া আমাদের যেন বিচরণ করিতে না হয়। তিনি আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া যেন বিনাশ না করেন। চিরকাল তিনি তাঁহার চরণে আশ্রয় দান করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, ভবিষ্যতে তাঁহারই পরিপালনে পুষ্ট হইয়া, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া যেন তাঁহারই পথের ভিখারী হইয়া থাকি। এস আমরা নামের মালা তাঁহাকে পরাইয়া দিই। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও বিরাজমান থাকাতে আমাদের সকল স্থান, সকল লোক পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারই সৌন্দর্য্যে সকলই সুন্দর মনে হয়। ধর্ম্মের অভাব ও আমাদের আলস্য ঔদাস্য বশতঃ তিনি আপন সুন্দর মূর্ত্তি না দেখাইয়া লুকায়িত রাখেন। তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, তাঁহার প্রিয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক পদে পদে নিজেদের দুরবস্থা দূর করিতে সমর্থ হই তাহারই জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যিনি আমাদের সর্ব্বসুখদাতা, আমরা তাঁহার নাম করিতে ভুলিয়া যাই বলিয়া আমরা এত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি।

আত্মশক্তি ও আত্মবল পাইবার জন্য পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগ চাই। তিনি আমাদের কার্য্যে প্রসন্ন হইলে আমাদের আত্মপ্রসাদ মিলিবে। অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব চাই। ভগবানের সঙ্গে মেলামেশাতে এবং তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন হইলে মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের মেলামেশার ভাব ভ্রাতৃভাব আপনা হইতেই আসিবে। ভগবানের সঙ্গে নিয়ত কথোপকথন হইলে, তাঁহার সঙ্গে মিলন হইলে, মনুষ্যের মধ্যে মিলন সহজেই আসিবে। প্রভুকে যখন শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে শিখিব তখন আর কাহারও উপর ঘৃণার ভাব আসিবে না। তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস। তিনি আমাদের রাজা, আমরা তাঁহার প্রজা। তিনি আমাদের পিতার পিতা, মাতার মাতা, আমরা তাঁহার দীন হীন সন্তান। তিনি অগতির গতি।

তিনি এই অনাথদিগকে কোলে লইয়া চোখের জল মুছাইয়া দিবেন।

সৎসঙ্গে অসতের যোগ হইলে অসৎ সৎ হইয়া যায়। পরমাত্মার যোগে আত্মার দুরবস্থা কি প্রকারে থাকিবে? ইহাতেই বুঝা যায় আত্মার উন্নতি ব্যতীত অবনতি নাই। আমরা ক্রমে এই মনুষ্য সমাজের ঋণমুক্ত হইয়া তাঁহার সমাজ ভুক্ত হইব। তাঁহার সেবক হইয়া চিরদিন তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব। পরমাত্মা মনুষ্যহৃদয়ে অবস্থিত থাকিলে আত্মার বিনাশ নাই। পরমাত্মার আকর্ষণ ফলে আত্মার সুগতি হইবেই হইবে। সতের সঙ্গে অসৎ কালে সতে পরিণত হইবে। যদি আমরা তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, যদি তাঁহার দিকে আমাদের মন ছুটিতে থাকে, আগ্রহ সহকারে সকল কর্ম্মে তাঁহাকে প্রসন্ন করি, তবে আমাদের মঙ্গল হইবেই হইবে। পরমাত্মা ও আত্মা ছায়াতপের ন্যায় একযোগে স্থিতি করিতেছে—যেমন দুটি পক্ষী পরস্পর মুখোমুখী হইয়া রহিয়াছে। একজন নিঃস্বার্থ ভাবে দান করিতেছেন, অপরে কেবল ফল ভোগ করিতেছে। এই পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ পাইয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখ কিসের? ধর্ম্ম ভাবে মন উন্নত হইলে, আত্মপ্রসাদ পাইলে সকল দুঃখ দূর হইয়া জীবন সুখময় হইয়া উঠিবে। ভগবানকে ভাল বাসিতে পারিলে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব দূর হইয়া যাইবে। তখন পৃথিবীর সকল লোককে আপন ভাবে দেখিতে পারিবে, মনুষ্য জীব জন্তু সকলের উপর ভালবাসা আসিবে। পিতা মাতার উপর ভক্তি ও কর্ত্তব্য, পতিভক্তি, পতিসেবা, ভ্রাতৃবাৎসল্য, সন্তানপালন, এ সকল কোথা হইতে আসে? এক ভগবদ্ভক্তির স্রোতে সকল কর্ত্তব্য, সকল সৎকার্য্য, সকল ভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়। ভগবানের প্রেমে ও ভক্তিতে হৃদয়কে প্লাবিত কর, যাহাতে উহার তরঙ্গ সকলের হৃদয়কে ডুবাইয়া দেয়। অন্তরে একবার ভগবানকে স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ কর, দেখিবে, সেইখানেই স্বর্গধাম, সেই পরম প্রভুকে সদাসর্ব্বদা সেইখানেই দেখিতে পাইবে। সর্ব্বত্র বিরাজমান পরমেশ্বরের সঙ্গে সেইখানেই মিলন হয়, সেইখানেই তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হয়, তাঁহার আদেশ উপদেশ সেইখান হইতেই পাই। চক্ষু মুদিলে হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে দেখি, তাই হৃদয়ই আমাদের স্বর্গধাম। সেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মহারাজাধিরাজ প্রভুকে অন্তর ভিন্ন আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাই না। বহির্জগতে এতদিন ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ধরিতে পারি নাই। বহির্জগতে সকলি অনিত্য ও অনিশ্চিত। মোহে আচ্ছন্ন হইলে বহির্জগত আপাততঃ সুন্দর দেখায় বটে কিন্তু পরিণামে তাহার মলিনতা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। একবার জ্ঞানালোকে হৃদয়ক্ষেত্র উজ্জ্বল কর, দেখিবে সকল জঞ্জাল, সকল অপবিত্রতা দূর হইয়া যাইবে, নিশাচর সম রিপুগণ সেখান হইতে দূরে পলায়ন করিবে, ভগবানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হইবে। সেই সৌন্দর্য্য দেখিলে চিরকাল সেইখানে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা যায়। মনে হয় জন্ম জন্ম এই চরণে দাস হইয়া পড়িয়া থাকি। ভাগ্যবলে সেই সুন্দর মূর্ত্তির বিকাশ দেখিলে আর নড়িবার যেন ক্ষমতা থাকে না।

কিন্তু অন্তর্জগতে প্রবেশের পথ সে অতি দুর্গম পথ। নিশাচর রিপুগণ মোহান্ধকারে তাহার চতুর্দ্দিকে নিত্য বিচরণ করিতেছে। সেই বলবান রিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী না হইতে পারিলে প্রভুর দর্শন পাওয়া অসম্ভব। এই রিপুগণকে পরাজিত করিয়া নিজবশে আনা চাই। যাঁহারা বহির্জগতে তাঁহাকে না ভুলিয়া নিষ্কাম ও পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে রিপুদিগের উপর জয়লাভ সহজে হয়। প্রভু তাঁহাদের সহায় হন, প্রভুর নিকট হইতে তাঁহাদের আহ্বান আইসে। যাঁহারা বাহিরের অনিত্য সুখ সৌভাগ্য তুচ্ছ করিয়া নিরঞ্জন নিখিল কারণের দর্শন পাইবার জন্য রিপুগণের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের উপরে ভগবানের কৃপা আসে। তাঁহাদিগকে তিনিই শক্তি দেন ও বল দেন। তাঁহারা সংগ্রামে পরাজিত না হইয়া প্রভুর কাছে আনীত হন। অন্তর্যামী ভগবানকে পাইতে হইলে অনেক সাধ্য সাধনা ব্যতীত অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া কঠিন। প্রভুর দর্শন অতি দুর্লভ। সংসারের দুঃখ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কচিৎ কেহ ভাগ্যবলে সেই সুখসাগরে আসিয়া পড়ে। একবার কোন প্রকারে সেখানে আসিয়া সেই সুন্দর মূর্ত্তির বিকাশ দেখিলে অনন্তকাল সেইখানেই স্থিতি করিতে ইচ্ছা হয়। সেই সুন্দর পুরুষ তিনি আমাদের স্বামী। কি করিয়া তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন হইব? তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, কি করিয়া তাঁহার চরণ ধরিব? সেই দেবদেবের পূজা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিব?—কিরূপে তাঁহার প্রসাদ লাভে চিরকৃতার্থ হইব?

হে প্রভু! তোমার আশীর্ব্বাদ, তোমার সহায়তা সকল কার্য্যে চাই। অটল বিশ্বাসে, অটল প্রেম ও ভক্তিভরে তোমাকে পূজা করিতে শিখিলে আমরা প্রত্যেক কার্য্যে তোমার সহানুভূতি পাইব। সহাস্য বদনে আমাদের দিকে একবার ফিরিয়া চাও, তাহা

হইলেই আমরা পরম কৃতার্থ হইব। কোন্ মুখ হইয়া ধ্যান করিলে তোমার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাইব, সেই মুখ করিয়া আমাদিগকে বসাইয়া দাও। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, যে দিকে ফিরি সেই দিকেই যেন তোমাকে দেখি। যেমন শত সহস্র বারিধারায় অঙ্গ বিধৌত হইলে প্রতি লোমকূপ পরিষ্কার হইয়া খুলিয়া যায় এবং শরীরে নির্ম্মল রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ শত সহস্র নাম জপ করিয়া অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে হৃদয়ে বিমল অমৃত রসের সঞ্চার হয়। তোমাকে নামের দ্বারা পূজা করিয়া তোমার প্রেমে আমাদের প্রেম ঢালিয়া দিব, তোমাকে প্রীতি উপহার দিয়া জীবন সার্থক করিব। তোমাকে যখন গুরু বলিয়া ভাবি তখন ভক্তিভরে মস্তক নত করিবার ইচ্ছা হয়। যখন পিতা মাতা বলিয়া ভাবি তখন শিশুর মত স্নেহ পাইতে কত না ইচ্ছা করে, দৌড়িয়া গিয়া তোমার ক্রোড়ে স্থান লইতে ইচ্ছা যায়। পাপভারাক্রান্ত এই মনকে তোমার নামের দ্বারা ধৌত করিয়া পুণ্যময় জীবন লাভ করিতে ইচ্ছা যায়। তোমারই ক্রোড়ে গিয়া শান্তি লইতে ইচ্ছা হয়। বন্ধুভাবে যখন তোমাকে দেখি তখন অন্তরের বন্ধু এমন আর কে আছে—কাহাকেও ত খুঁজিয়া পাই না। নামের কি মহত্ত্ব? নামের দ্বারাই তোমাকে অর্চ্চনা করিতে পারা যায়। দয়াময় নামটী উচ্চারণ করিবা মাত্র মনে কত আনন্দ ভালবাসা প্রকাশ পায়; নামেতে তুমি সুন্দর হও, তোমার জ্যোতি প্রকাশ পায়। ভালবাসার উচ্ছ্বাস হইলে কত নামে তোমাকে ডাকিতে ইচ্ছা করে—কিন্তু কিছুতেই যে তৃপ্তি নাই। তোমার নামই আমাদের মুক্তির সোপান। ফুল চন্দনের বদলে নামের দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিব। মা! তোমার নামের কত মাহাত্ম্য! তোমার নাম উচ্চারণ মাত্র মনে হয় যেন সকল অপবিত্রতা দূর হইয়া গিয়াছে। নামের কল্যাণে আত্মা পরমাত্মার মিলন সংঘটিত হয়। নামের বলে অবিশ্বাস সন্দেহ কিছু মাত্র থাকে না, সকল অমঙ্গল দূর হইয়া যায়। হে বিশ্বকর্ম্মা! তোমার সৃষ্টি-কৌশল অনন্ত। সৃষ্টি রচনায় তোমার মঙ্গল ভাব নিহিত। হে মহদ্ভয়! তোমার মহিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, তোমার নামে তোমার যশোগানে পৃথিবী ধ্বনিত হউক।

নানা কথা।

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের পরলোকগতা জননীর আদ্য-শ্রাদ্ধোপলক্ষে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, নববিধান হইতে বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং সাধারণ সমাজ হইতে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আহূত হইয়াছিলেন। প্রারম্ভে শ্রাদ্ধকর্ত্তা সুমধুর কণ্ঠে একটি সঙ্কীর্ত্তন করিলে সকলেই ব্রহ্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েন। পরে তত্ত্বভূষণ মহাশয় অতি গম্ভীররূপ আত্ম-সমাধানের সহিত ব্রহ্মোপাসনা শেষ করিলেন। অতঃপর শ্রদ্ধাস্পদ সুন্দরীবাবু তাঁহার পরলোকগতা জননীর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। পরে শাস্ত্রী মহাশয় শ্রাদ্ধকালের পাঠ্য কঠোপনিষদের তিন অধ্যায় পাঠ করিলে শ্রাদ্ধ কার্য্য শেষ হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্ত্তা আমাদের সমাজে ১০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

১৮৩০ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তিস্বীকার।

	নাম	স্থান	মূল্য
শ্রীযুক্ত	প্যারীমোহন রায়	কলিকাতা	২৲
„	গোবর্দ্ধন শীল	চন্দননগর	৫৲
„	হৃদয়নাথ আচার্য্য	কাউরেড	৩৶০
„	আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	৪৲
„	রমণীমোহন রায়	কাকনা	১০৵০
„	লালবিহারী বড়াল	হুগলী	৬৷৵০
„	তুলসীদাস দত্ত	কালাঘাট	৩৷৵০
„	শ্যামলাল সরকার	কলিকাতা	৩৲
„	হরকুমার সরকার	ঘোড়ামারা	৩৷৵০
„	গোকুলচন্দ্র ধর	ত্রিবেণী	৩৶০
„	ষষ্ঠীচন্দ্র নন্দী	কলিকাতা	৩৶০
„	অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	১৶০
„	অবিনাশচন্দ্র দত্ত	কলিকাতা	২৶০
„	এন্, সি, সেন	আলিপুর	৩৶০
„	দিগম্বর দত্ত	ক্ষীরপাই	৫৲
„	নৃত্যগোপাল বসু	কলিকাতা	৯৸৶০
„	পঞ্চানন মিশ্র	মোদনীপুর	১৲
„	হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়	কুচবিহার	১৷০
„	মহেন্দ্রনাথ সেন	ডিব্রুগড়	৫৲
„	দুর্গারাম বসু	তমলুক	১২৲
„	গৌরলাল রায়	কাকিনা	৬৷৵০
„	কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া	শিলং	৫৲

নব বর্ষের দান।

	নাম	মূল্য
শ্রীমতী	প্রফুল্লময়ী দেবী	২৲
„	সুহাসিনী দেবী	১৲

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় বুধবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

নব-বর্ষের উপদেশ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ১লা বৈশাখ বুধবার বেদী হইতে প্রদত্ত উপদেশ।

ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে অদ্য নব বৎসরের প্রথম সায়ংকালেই আমরা আমাদের সাপ্তাহিক উপাসনার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাতঃকালে আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া সম্বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবনে পবিত্রতা লাভ করিবার জন্য যাচ্ঞা করিয়াছি। আবার এই সায়ংকালে তাঁহার পবিত্র উপাসনার অবসর প্রাপ্ত হইলাম। এখন আমরা তাঁহার নিকটে কি ভিক্ষা করিব? ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনার ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যাত্মজ্ঞান উপার্জ্জনের ধর্ম্ম। এই ত্রিবিধ উপায় উপার্জ্জনের জন্য আমরা আজ ঈশ্বরের নিকটে শক্তি ভিক্ষা করিব। তিনি দাতা, তিনি ধাতা, তিনি বিধাতা। আমাদের সাধনের মূলে যদি তাঁহাকে লক্ষ্য না করিতে পারি, তবে আত্মা কোথা হইতে সাধন-বল লাভ করিবে। তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করিতে পারিলেই তিনি আমাদের লক্ষীভূত হইয়া স্বীয় বলে আমাদিগকে বলীয়ান করিবেন। সেই বলই আমাদের ধর্ম্মসাধনের সহায়। মহর্ষিদেব বলিয়াছেন, "আমারদের আপনার আপনার যত্ন সহকারে ধর্ম্মপথে প্রতিপদ অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা অবস্থার দাস না হইয়া যাই, প্রবৃত্তির স্রোতেই তৃণের ন্যায় নীয়মান না হই—কালের গতিতেই গমন না করি—আপনার প্রতি আপনি প্রভু থাকিয়া ঈশ্বরের পথে পদার্পণ করি, দিনে নিশীথে আপনার পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিতে পাই; এই জন্য আমাদের নিয়তই যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক, কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিন্ন আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কি হইবে?" এই জন্যই ব্রহ্মোপাসনার মূলে চিত্ত সমাধানের প্রয়োজন হইয়াছে। কেবলি উপাসনার সময়ে নহে কিন্তু অহরহ, দিনে নিশীথে কর্ম্মে ও বিশ্রামে তাঁহাতে চিত্ত সমাধান চাই। গঙ্গাদি নদী পৃথিবীর ভূমি সকলকে উর্ব্বরা করিয়া এবং পিপাসিত কাতর জনকে সুশীতল বারি দানে স্নিগ্ধ করিয়া

সাগর সঙ্গমে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু নির্ঝর নিকরের সহিত যদি মূলে তাহাদের যোগ না থাকিত তবে সে প্রবাহ, সে শক্তি, এবং সেই পুণ্য-কর্ম্ম সাধনের সফলতা কি প্রকারে তাহারা প্রাপ্ত হইত? সেই রূপ আমরা এই ঈশ্বরের বিচিত্র সুন্দর সৃষ্ট সংসারে কর্ম্মকর্ত্তা রূপে তাঁহারই দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই সংসারে আমাদের বহু এবং বিবিধ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। স্ত্রীগণকে লক্ষ্মী স্বরূপিনী ও সহধর্ম্মিণী করিয়া সংসারের শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা, পুত্রগণ ও কন্যাগণকে জ্ঞান শিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগের জীবনকে উন্নতির পথে উপনীত করা, বন্ধু ও প্রতিবাসীগণের প্রতি প্রীতি দানে তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ পূর্ব্বক জনপদের শান্তি রক্ষা করা এবং অন্যবিধ বহু কর্ত্তব্য আমাদের এখানে সাধন করিতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা আত্মার আত্মা সেই পরমাত্মা হইতে তাঁহার সর্ব্বগুণময় ভাব আকর্ষণ না করিতে পারি তবে কি প্রকারে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালনে সফলতা লাভ করিতে পারি? তিনি আমাদের সকল শক্তির মূল, তাঁহাকে লাভ করা চাই। কিন্তু তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য নিষ্কাম প্রীতির সহিত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা চাই। যখন ঈশ্বরের জন্য আমাদের একটি গভীর অভাব বোধ হয়—আর কিছুতেই আত্মা তৃপ্ত হয় না; যখন সকল সম্পত্তির মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অভাবে শোক-সাগরে নিমগ্ন হই, তখন তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা করি, তুমি হৃদয়ে আসীন হও—আসীন হইয়া আমাদের তাপিত হৃদয়কে শীতল কর। সংসার যখন আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না, সংসারের সম্পত্তি বিপত্তি বলহীন হয়—যখন তাঁহাকে না পাইয়া শরীরে আরাম থাকে না, মনের প্রসন্নতা থাকে না; তখন সে ঘন বিষাদ-অন্ধকারের পরপারে তাঁহার মুখজ্যোতি লাভ করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি, তাঁহাকে আহ্বান করি। এই প্রকারে যখন আমরা ব্যাকুল হই; তখন তিনি আমাদের আন্তরিক প্রার্থনানুরূপ ফল প্রদান করেন—আপনাকে দিয়া আমাদের হৃদয় পূর্ণ করেন। প্রার্থনাই আমাদের বল, যেমন বালকের বল মাতার নিকটে ক্রন্দন। যদি আমরা কিছুই না পারি, তথাপি আমাদের আশা, আমাদের ইচ্ছা, আমাদের অভাব সেই বাঞ্ছা-কল্পতরুর পদতলে আনিয়া অর্পণ করিতে পারি। আমরা যাহা বলি, তিনি তাহা শ্রবণ করেন, তিনি অমৃত প্রেরণ করেন, আমাদের আত্মা সেই অমৃত পান করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া অনন্ত মঙ্গলের পথে চলিবার উপযুক্ত হইতে থাকে। বৈদিক যজ্ঞ কালে যখন সপ্ত হোতা যেমন বলিতেন, সেই এই নব বৎসরের সায়ংকালে এই ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া আমরাও সমস্বরে বলি,

"তস্মিন্তসহস্রশাখে নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা।"

হে সহস্রশাখ ভগবান্ আমরা আজ সকলে একত্র হইয়া সকল পরিবারের সহিত এবং সকলের শরীর মন আত্মার সহিত তোমাতে নিমজ্জিত হই।

"হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। আমরা বিষয় বিভবের নিমিত্তে তোমার নিকটে কি প্রার্থনা করিব? সমস্ত দিবস, সমস্ত রজনী তোমার করুণা তো আমাদের শরীর

ও মন পোষণ করিতেছে। সম্পত্তি বিপত্তি সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কার তোমার হস্ত হইতেই প্রেরিত হইয়া নিয়ত আমাদের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিতেছে। যে অবধি জীবন ধারণ করিয়াছি, সেই অবধিই তোমার করুণা তুমি মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছ। অতএব তোমার নিকটে কি প্রার্থনা করিব? তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল হউক। আমাদের কিসে কল্যাণ, কিসে বিপর্য্যয় হয় আমরা তাহার কিছুই জানি না, তাহা তুমিই জান। কিন্তু তোমার প্রসাদে এই সত্যটি জানিয়াছি যে তোমাকে লাভ করিতে পারিলে আমাদের সকল মঙ্গল ও সকল সম্পত্তি লাভ হয়। যদি সমুদয় বিষয় বিভব, মান সম্ভ্রম, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই পাওয়া যায়, তবে তাহাই মঙ্গল; তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি সমুদয় পৃথিবীর রাজাও হই, তবে তাহা হইতে আর অমঙ্গল কিছুই নাই। তুমি হৃদয়ে আইলে আমাদের সকল মঙ্গল লাভ হয়। অতএব তোমার নিকটে আমরা এই বর চাই—"আবিরাবীর্ম্ম এধি" তুমি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, মঙ্গল।

চতুর্থ উপদেশ।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

এ পর্য্যন্ত আমরা কি করিয়াছি? কোন ভৌতিকতত্ত্ববেত্তা কিংবা কোন রাসায়নিক পণ্ডিত যেরূপ কোন সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া আবার তাহার মূল উপাদানে ফিরাইয়া আনেন, আমরা কতকটা সেইরূপ করিয়াছি। এই মাত্র প্রভেদ, আমরা যে ব্যাপারের বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহা আমাদের বাহিরে নহে—তাহা আমাদের অন্তরে অবস্থিত। তাছাড়া, বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটা উভয়ক্ষেত্রে একই প্রকার। উহার মধ্যে কোন ঘর-গড়া মত কিংবা মানিয়া-লওয়া সিদ্ধান্ত নাই; উহাতে কেবল প্রত্যক্ষ পরীক্ষার কথাই আছে।

এই পরীক্ষাকে আরও দৃঢ়নিশ্চয় করিবার জন্য, আর একটু রকম-ফের করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অন্যের কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজ যখন আমরা দর্শন করি তখন আমাদের মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা পরীক্ষা না করিয়া,—আমরা নিজে যখন কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজ করি তখন আমাদের মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহাই আমাদের অন্তরাত্মাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক্। এইরূপ স্থলে নৈতিক ব্যাপারের বিচিত্র উপাদানগুলি আরও স্পষ্টরূপে আমাদের চোখে পড়িবে এবং উহাদের পারম্পর্য্যও আমাদের নিকট সমধিক প্রকাশ পাইবে।

মনে কর, আমার কোন বন্ধু মৃত্যুকালে কিছু টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ টাকা অমুক ব্যক্তিকে যেন দেওয়া হয়; টাকাটা যাঁহার নামে দিয়া গেলেন, তিনিও জানেন না যে ঐ টাকা তাঁহার প্রাপ্য। তাহার পর যিনি আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইল; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত কথাটিও চলিয়া গেল। যাঁহার জন্য এই টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে, তিনি